ইসলামী
সংগঠন
এ. কে. এম. নাজির আহমদ

সূচীপত্র

ইসলামী সংগঠনের গুরুত্ব

সংগঠন শব্দের সাধারণ অর্থ সংঘবদ্ধকরণ। এর বিশেষ অর্থ দলবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ জীবন।

ইকামাতে দীনের কাজ আঞ্জাম দেয় যেই সংগঠন তাকেই বলা হয় ইসলামী সংগঠন।

ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইকামাতে দীনের সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফারয।

সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন কায়েম হতে পারে না। সংগঠিত উদ্যোগ ছাড়া ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য বিকাশ সাধন সম্ভবপর নয়।

সংগঠন সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰه جَمِيْعًا -

"তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে (অর্থাৎ ইসলামকে) আঁকড়ে ধর।"

আলে ইমরান ঃ ১০৩

সংগঠন সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের (সা) বাণী

اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰه فَانَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَة قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ الاَّ اَنْ يَّرْجِعَ وَمَنْ دعَا بِدعْوٰى جَاهِلِيَّة فَهُوَ مِنْ جُثٰى جَهَنَّمَ - قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى؟ قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ -

“আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। (বিষয়গুলো হচ্ছে) সংগঠন, নেতৃ নির্দেশ শ্রবণ, নেতৃ নির্দেশ পালন, আল্লাহর অপছন্দনীয় সবকিছু বর্জন এবং আল্লাহর পথে জিহাদ। যেই ব্যক্তি ইসলামী সংগঠন ত্যাগ করে এক বিঘৎ পরিমাণ দূরে সরে গেছে সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলেছে, তবে সে যদি সংগঠনে প্রত্যাবর্তন করে তো স্বতন্ত্র কথা। আর যেই ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে আহ্বান জানায় সে জাহান্নামী।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, ছালাত কায়েম এবং ছাওম পালন করা সত্ত্বেও?” আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “ছালাত কায়েম, ছাওম পালন এবং মুসলিম বলে দাবী করা সত্ত্বেও।”

– আহমাদ ও হাকেম

لاَ يَحِلُّ لِثَلاَثَةٍ يَكُوْنُوْا بِفَلاَةٍ مِن الاَرْضِ الاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحدهُمْ ـ

“তিনজন লোক কোন নির্জন প্রান্তরে থাকলেও একজনকে আমীর না বানিয়ে থাকা জায়েয নয়।”

اذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِى سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحدهُمْ ـ

“তিনজন লোক সফরে বের হলে তারা যেন তাদের একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়।” – সুনানু আবী দাঊদ

مَنْ سرَّهُ اَنْ يَّسْكُنَ بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةَ فَلْيَلْزِمِ الْجمَاعَةَ ـ

“যেই ব্যক্তি জান্নাতের আনন্দ উপভোগ করতে চায় সে যেন সংগঠনকে আঁকড়ে ধরে।” – সহীহ মুসলিম

ومَنْ مَاتَ وهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجمَاعَةِ فَانَّه يمُوْتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً ـ

“যেই ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।” – সহীহ মুসলিম

সংগঠন সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) উক্তি,

لاَ اسْلاَمَ الاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَ جَمَاعَةَ الاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ الاَّ بِطَاعَةٍ ـ

"সংগঠন ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া সংগঠন নেই। আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।"

এ সব আয়াত, হাদীস এবং উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে–

(১) মুমিনদেরকে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে।

(২) এককভাবে জীবনযাপন করার অধিকার তাদের নেই।

(৩) একক জীবন যাপনকারী শাইতানের শিকারে পরিণত হয়।

(৪) ইসলামী সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া জাহিলিয়াতে প্রত্যাবর্তনের শামিল।

(৫) সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন জান্নাত প্রাপ্তির অন্যতম পূর্বশত।

(৬) সংগঠন না থাকলে ইসলাম সগৌরবে টিকে থাকতে পারে না।

ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কোন সখের ব্যাপার নয়। ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশের সুস্পষ্ট লংঘন। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন।

ইসলামী সংগঠনের উপাদান

নেতৃত্ব, কর্মী বাহিনী এবং সংগঠন পরিচালনা বিধি– এই তিনটি হচ্ছে সংগঠনের উপাদান।

ইসলামী নেতৃত্ব, ইসলামী কর্মী বাহিনী এবং ইসলামী পরিচালনা বিধি– এই তিনটি হচ্ছে ইসলামী সংগঠনের উপাদান।

যেই নেতৃত্ব ইসলামের আলোকে আত্মগঠন করে শুধুমাত্র আল্লাহর দীনের প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ ও কর্মী বাহিনী পরিচালনা করে সেই নেতৃত্বই ইসলামী নেতৃত্ব।

যেই কর্মী বাহিনী দুনিয়াবী কোন স্বার্থে তাড়িত না হয়ে কেবল আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী নেতৃত্বের অধীনে সময়, শক্তি ও অর্থের কুরবানী দিতে থাকে তা-ই ইসলামী কর্মী বাহিনী।

নেতা ছাড়া সংগঠন হয় না। তেমনি কর্মী ছাড়া শুধু নেতার উপস্থিতিতেই সংগঠন হয় না। নেতা ও কর্মী বাহিনী মিলিত হলে সম্ভাবনার দিক যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি এর সমস্যার দিকও আছে। সেই কারণেই নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনী যাতে নিজেদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা সঠিকভাবে জেনে নিতে পারে তার জন্য সংগঠনে কিছু পরিচালনা বিধি থাকে। আধুনিক পরিভাষায় এসব বিধি-বিধানের নাম সংবিধান।

ইসলামী সংগঠনের মূল বিধি-বিধান আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহ। অবশ্য আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত সংবিধানও ইসলামী সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এই সংবিধান যেহেতু আল কুরআন ও আস্‌সুন্নাহর শিক্ষার ভিত্তিতে রচিত হয় এবং ইসলামী সংগঠনের পরিচালনা ও সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেহেতু একে পবিত্র দলিল গণ্য করা হয় এবং এর কোন ধারা লংঘন করাকে শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা রূপে চিহ্নিত করা হয়।

মূলতঃ নেতৃত্ব, কর্মী বাহিনী এবং পরিচালনা বিধি নিয়েই সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়। চলার পথে আরও অনেক কিছু উপাদান যুক্ত হয়ে একে সমৃদ্ধ করে তোলে।

সমাজের চাকা গতিশীল। পরিবর্তনের ধারা এখানে লেগেই আছে। আকাঙ্খিত অনাকাঙ্খিত অনেক পরিবর্তনই এখানে ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তন অনাকাঙ্খিত ধারায় প্রবাহিত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে সমাজ জীবনে ইসলামের অনুপস্থিতি। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণেই সমাজে অশান্তি ও অস্বস্তি বিরাজ করে। আর এই অশান্তি ও অস্বস্তি থেকে বাঁচবার তাকিদে মানব প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মানুষের মনের ক্ষোভ অসন্তোষে এবং অসন্তোষ বিদ্রোহে পরিণত হয়। এভাবেই মানব সমাজে পরিবর্তনের পালা চলতে থাকে।

যখনই একটা পরিবর্তন ঘটে তখন মানুষ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বুঝতে পারে যে তারা যা দেখেছে তা মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। নতুন বোতলে পুরোনো মদই তাদের সামনে এসেছে। অশান্তি ও অস্বস্তি জগদ্দল পাথরের মতোই তাদের ওপর চেপে আছে। এথেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এভাবে প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

সমাজ পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব ভূমিকা পালনের জন্যই ইসলামের আগমন। ইসলাম মানব সমাজকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে একে নতুন ধাঁচে গড়ে তুলে মানব গোষ্ঠীর শান্তি ও স্বস্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে চায়।

এই শান্তি ও স্বস্তির নিশ্চয়তা বিধানের প্রয়োজনেই ইসলাম মানুষের ব্যক্তি জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহৎ গণ্ডী পর্যন্ত সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হতে চায়।

তবে ইসলাম নিজে নিজেই সমাজে কায়েম হয়ে যায় না। কোন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টার মাধ্যমেও ইসলাম কায়েম হতে পারে না। এর জন্য প্রয়োজন একদল মানুষের সংগঠিত উদ্যোগ। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।

ইসলামকে সমাজ জীবনে কায়েম করার পন্থা নিয়ে মানুষের মধ্যে মত পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। মত পার্থক্যের চক্করে পড়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিঘ্নিত হোক, এটা আল্লাহ্ চাননি। তাই তিনি জীবন বিধান পাঠানোর সাথে সাথে রাসূলও পাঠিয়েছেন জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পদ্ধতি শিক্ষা দেবার জন্য। আমাদের জন্য শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কর্মপন্থাই একমাত্র অনুসরণীয় কর্মপন্থা।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যেই সংগঠন গড়ে ওঠে তা মানুষকে আল্লাহর পথে আসার জন্য আহ্বান জানাতে থাকে। যারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসে সংগঠন তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে সুসংগঠিত শক্তিতে পরিণত করে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই সংগঠিত এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই হয় ঘুণে ধরা সমাজকে আঘাত হেনে ভেঙ্গে ফেলার এবং ইসলামী মূল্যমানের ওপর নতুন সমাজ বিনির্মাণের প্রধান উপাদান। ইসলামী সংগঠনের লোকদের দ্বারা যখন সরকার গঠিত হয় তখন সমাজের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সকল স্তরে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় জীবনের সবদিক ও বিভাগে। সমাজ থেকে রাজনৈতিক যুল্ম, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক ভেদাভেদ এবং অশ্লীলতা দূর হয়। সমাজের সর্বত্র কল্যাণের প্লাবন সৃষ্টি হয়। অশান্তি আর অস্বস্তির অভিশাপ থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে।

ইসলামী সংগঠনের লক্ষ্য

সংক্ষেপে বলা যায় ইসলামী সংগঠনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত পন্থায় মানব সমাজে কায়েম করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন।

আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের উপায় হচ্ছে আল্লাহ যেই উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্য সাধন করা। আর মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহর আব্দ হিসাবে আল্লাহর বিধান মুতাবিক আত্মগঠন, পরিবার গঠন, দল গঠন ও রাষ্ট্র গঠন।

মনে রাখা দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র দুনিয়ার বুকে মানুষের জন্য অতি বড়ো একটি নিয়ামাত। যেই জনগোষ্ঠী এই নিয়ামাতের কদর করতে প্রস্তুত নয় আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন খামাখাই তাদেরকে এতোবড় নিয়ামাত দান করেন না। তাই যুগে যুগে দুনিয়ার অকৃতজ্ঞ কাউমগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের মতো নিয়ামাত থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে।

অকৃতজ্ঞ মানবগোষ্ঠী ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটি খাস নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত থাকলেও তাতে কিন্তু ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের ব্যর্থতার কিছুই নেই। কারণ যারা ইখলাসের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন এবং আখিরাতের মহা পুরস্কার তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন।

ইসলামী সরকার গঠন করে তার পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লাহর দীন কায়েম করার সুযোগ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সেই সুযোগ না পেলে তার জন্য হাহুতাশ করা বা মন ভাঙ্গা হওয়া সেই ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব যার চিন্তাধারায় আখিরাত প্রাধান্য পায়নি।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব কাঠামো

ইসলামী সংগঠনে একটি বিশেষ নেতৃত্ব কাঠামো আছে। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাণী এবং আসহাবে রাসূলের অনুশীলন আমাদেরকে ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান করে।

আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনের শেষভাগে কোন কোন সাহাবী মুসলিম উম্মাহর পরবর্তী নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করেন। তাঁর পর কে নেতা হবেন এটাই ছিল তাঁদের জিজ্ঞাসা। তাঁদের নিকট এটা সুস্পষ্ট ছিলো যে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর একজন ব্যক্তিই হবেন তাঁদের নেতা। তবে কোন ব্যক্তি নেতা হলে ভালো হবে এটাই তাঁরা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। জবাবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اِنْ تُؤَمِّرُوْا اَبَا بَكْرٍ تَجِدُوْهُ اَمِيْنًا زَاهِدًا فِى الدُّنْيَا رَاغِبًا اِلَى الْاٰخِرَةِ، وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عُمَر تَجِدُوْهُ قَوِيًا اَمِيْنًا لاَ يَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ-وَاِنْ تُؤَمِّرُوْا عَلِيًّا وَلاَ اَرَاكُمْ فَاعِلِيْنَ تَجِدُوْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا يَاْخُذُكُمْ الطَّرِيْقَ الْمُسْتَقِيْمَ-

"তোমরা যদি আবু বাকরকে আমীর বানাও তাকে পাবে আমানাতদার, দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ এবং আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট। তোমরা যদি উমারকে আমীর বানাও তাকে পাবে শক্তিধর, আমানাতদার এবং আল্লাহর ব্যাপারে সে কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। আর যদি আলীকে আমীর বানাও– আমার মনে হয় না তোমরা তা করবে– তাহলে তাকে পাবে পথ

প্রদর্শনকারী ও পথ প্রাপ্ত ব্যক্তি। সে তোমাদেরকে সঠিক পথে চালাবে।"

– মুসনাদে আহমাদ

আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই জওয়াব থেকে আমরা দুটো মূলনীতি পাই। প্রথম মূলনীতি হচ্ছে, মুসলিমদের আমীর একজনই হবেন। কমাণ্ডিং পজিশন একজনকেই দেয়া হবে, একাধিক ব্যক্তিকে নয়। দ্বিতীয় মুলনীতি হচ্ছে, মুসলিমগণ তাঁদের মধ্য থেকে একজন আমীর নির্বাচিত করে নেবেন তাঁদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে।

সাহাবীগণের প্রশ্নের জওয়াবে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি যদি মাত্র একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতেন তাহলে সাহাবীগণ সেই ব্যক্তিকে আমীর হিসাবে গ্রহণ করে বাইয়াত করা বাধ্যতামূলক মনে করতেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুসলিম উম্মাহকে আমীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বাধীন রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ইচ্ছাও ছিল তাই। তা না হলে আল্লাহ ওহী পাঠিয়ে তাঁর পছন্দনীয় বিকল্প ব্যবস্থা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাধ্যমে উম্মাহকে জানিয়ে দিতেন।

ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্ব নির্বাচন

ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগ্যতম ব্যক্তি যাতে গুরুত্বপূর্ণ আসনে আসীন হতে পারে সেদিকে নির্বাচকমণ্ডলীকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়।

নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির তাকওয়া সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হয় সর্বাগ্রে। তাকওয়া যদিও ব্যক্তির ভেতরের ব্যাপার তা ব্যক্তির কথাবার্তা, পোশাক পরিচ্ছদ, চাল চলন, লেন দেন এবং যাবতীয় কার্যকলাপের ওপর সুস্পষ্ট ছাপ রাখে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত এগুলোর দিকে নজর রাখলেই ব্যক্তির তাকওয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি ছালাত আদায় করছে আর তার দাড়ি নিয়ে খেলছে। তখন তিনি বললেন, "এই ব্যক্তির অন্তরে খুশু থাকলে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপরও খুশু পরিলক্ষিত হতো।"

প্রকৃতপক্ষে তাকওয়ার ব্যাপারটি ঠিক এমনই।

ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচন কোন সাধারণ ব্যাপার নয়। এই নির্বাচনে কেউ প্রার্থী থাকে না। বরং পদপ্রার্থী হওয়া এই সংগঠনের দৃষ্টিতে মারাত্মক অন্যায়। তাই নির্বাচক মণ্ডলীকে সংগঠনের সর্বত্র যোগ্যতম ব্যক্তি খুঁজে বেড়াতে হয়।

ইসলামী সংগঠনের সদস্যদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে এই নেতৃত্ব নির্বাচন। কারো পক্ষে বা বিপক্ষে কোন ক্যানভাস চলে না এখানে। নিজের বিচার বুদ্ধি ও উপলব্ধিকে সম্বল করেই নির্বাচকগণ এখানে ভূমিকা পালন করে। তাই তাদেরকে গভীরভাবে ভাবতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হয়। নিজের বিচার বুদ্ধির সবটুকু প্রয়োগ করে বেছে নিতে হয় যোগ্যতম ব্যক্তিকে।

সকলের মত ব্যক্ত হওয়ার পর সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থা অর্জনকারী ব্যক্তিকে নেতা ঘোষণা করা হয়। তখন সকলেই তাকে নেতারূপে গ্রহণ করে তাঁর নির্দেশে জামায়াতী যিন্দিগী যাপন করতে থাকে।

ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী

ইসলামী সংগঠনে নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। নেতৃত্বকে কেন্দ্র করেই গোটা কর্মীবাহিনী আবর্তিত হয়। নেতৃত্বের গুণাবলীই কর্মীবাহিনীর ওপর প্রতিবিম্বিত হয়। এখানে নেতৃত্বের কয়েকটি বুনিয়াদী গুণের কথা আলোচিত হচ্ছে অতি সংক্ষেপে।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামী নেতৃত্বকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে হয়। ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে ইবলীসী চিন্তা প্রসূত যেসব মতবাদ দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে জীবন ও জগত, মানব জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে সেই মতবাদগুলোর বক্তব্য এবং সেগুলো সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে মানবগোষ্ঠী কোন্ কোন্ সমস্যার সম্মুখীন– এসব কিছু সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। সাধারণ জ্ঞানের দৈন্যও তাঁর থাকা উচিত নয়। তদুপরি নেতাকে যেহেতু মানুষ চালাতে হয় সেই জন্য মানব মনকে বুঝার যোগ্যতাও তাঁর থাকা চাই। তাই মনোবিজ্ঞানও তাঁর ভালোভাবে পড়া প্রয়োজন। জ্ঞানই শক্তি কথাটা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারলে নেতার পক্ষে কেবল কর্মীবাহিনীর ওপরই নয়, এর বাইরে যেই বিশাল মানবগোষ্ঠী রয়েছে সেখানেও প্রভাব বিস্তার করা সহজ হয়।

উন্নত আমল

নেতাকে হতে হবে ইসলামের মূর্ত প্রতীক। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ এবং যাবতীয় কাজকর্মে ইসলামের সঠিক রূপ প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মূল নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চরিত্র সকলের জন্য সর্বোত্তম উদাহরণ। তিনি ছিলেন বিমূর্ত আল কুরআন। মুসলিম জীবনের যেই রূপটি

আল কুরআন অংকন করেছে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন তারই জীবন্ত রূপ। তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলোতে ইসলামের যেই সৌন্দর্য ফুটে উঠেছিলো প্রধানতঃ তাতে আকৃষ্ট হয়েই অমুসলিমগণ ইসলাম গ্রহণ করতো।

নম্র ব্যবহার

রুক্ষ ভাষা এবং রূঢ় আচরণ মানুষকে আহত করে। রূঢ় আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি কখনো মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে না। ইসলামী নেতার পক্ষে রূঢ় আচরণ বড়ো রকমের অযোগ্যতা। কর্মীগণ সাংগঠনিক শৃঙ্খলার খাতিরে এই ধরনের নেতার আনুগত্য করলেও তাদের অন্তরে তীব্র বেদনা থাকে। বেদনাহত কর্মীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গতিশীল হয়ে কাজ করতে পারে না। তাই নেতাকে অবশ্যই নম্র ব্যবহারের অধিকারী হতে হবে। তাঁর আচরণের সৌন্দর্য কর্মীদেরকে তাঁর দিকে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে। এতে করে সংগঠনের আভ্যন্তরীণ সংহতি অত্যন্ত মজবুত হবে, এটাই স্বাভাবিক।

সাহসিকতা

ইসলামী সংগঠনের নেতা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবেন না। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়ার দাবীও এটাই। যেই হৃদয়ে আল্লাহর ভয় থাকবে সেই হৃদয় অন্য কাউকে ভয় করবে, তার অবকাশ কোথায়! আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, " যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে দুনিয়ার সবকিছু তাকে ভয় করে। কিন্তু যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করে না দুনিয়ার সবকিছু তাকে ভয় দেখায়।" সংগঠনের নেতা নির্ভীক হলে তার প্রভাব পড়ে সংগঠনের কর্মীবাহিনীর ওপর। এই ধরনের নেতার কর্মী বাহিনী বিপদ-মুসিবাত দেখে মনভাঙ্গা হয় না। হিম্মতহারা হয় না।

সময়ানুবর্তিতা

নেতাকে প্রতিদিন অনেক কাজ করতে হয়। অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। অনেক স্থানে যেতে হয়। দিনের শুরুতেই করণীয় কাজের

তালিকা তৈরি করে নেতা যদি সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করে চলেন, তিনি একদিনেই বহু কাজ করতে পারেন। এক জায়গায় সময় প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে তাঁর সারা দিনের কাজগুলো একের পর এক ডিস্টার্ব হতে থাকবে। দিনান্তে হয়তো দেখা যাবে বেশ কয়েকটি কাজ কিছুতেই শেষ করা গেলোনা। সময় সম্পর্কে সদা সচেতন থাকলে এবং প্রতিটি কাজের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করলেই দেখা যাবে সারাদিনের করণীয় সবগুলো কাজই সম্পন্ন করা গেছে।

সাংগঠনিক প্রজ্ঞা

সংগঠনের নেতাকে অবশ্যই সবচেয়ে বেশি সাংগঠনিক প্রজ্ঞার অধিকারী হতে হবে। সংগঠন গড়ে তোলার যোগ্যতা, কর্মী পরিচালনার যোগ্যতা, সংগঠনের সংহতি সংরক্ষণের যোগ্যতা, ময়দান বিশ্লেষণ করার যোগ্যতা, সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা, জনশক্তিকে কর্মমুখর রাখার যোগ্যতা, কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মপন্থা উদ্ভাবনের যোগ্যতা এবং সগঠনের কর্মীদেরকে গ্যাপ অব ইনফরমেশন থেকে বাঁচিয়ে রাখার যোগ্যতা নেতার অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রেরণা সৃষ্টির যোগ্যতা

নেতা হবেন কর্মীদের জন্য প্রেরণার উৎস ও সান্ত্বনার স্থল। নেতার কথাবার্তা কর্মীদের মাঝে হতাশা বা নিরাশার বিষবাষ্প ছড়াবে না। তাঁর কথা শুনে কর্মীরা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠবে।

নেতা হবেন কর্মীদের জন্য বটগাছ যার ছায়াতে এসে কর্মীগণ অন্তরকে শীতল করতে পারবে। প্রতিকূলতার আঘাত খেয়ে খেয়ে কর্মীরা যখন অস্থির হয়ে ওঠে তখন মনের বেদনা প্রকাশ করার জন্য তারা নেতার নিকট ছুটে আসে। নেতার হাসিমাখা মুখের মিষ্ট সান্ত্বনা-বাণী তাদের মনের জ্বালা দূর করে দেয়। নেতার হৃদয়ে কর্মীদের জন্য যে মুহাব্বাতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকে তাতে সিক্ত হয়ে তারা প্রশান্ত হয়। যেই নেতা কর্মীদের ওপর বটগাছের মতো শীতল ছায়া বিস্তার করতে পারেন না তিনি নাৎসী পার্টির নেতা হতে পারেন, কিন্তু ইসলামী সংগঠনের নেতা হওয়া তাঁর সাজে না।

সুভাষণ

নেতা সুবক্তা হওয়া প্রয়োজন। কম কথায় বেশি ভাব প্রকাশ উত্তম ভাষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বক্তৃতা পয়েন্ট ভিত্তিক হলে শ্রোতার পক্ষে বুঝা সহজ হয়। বক্তৃতার ভাষা সহজ হওয়া দরকার। বক্তৃতার প্রারম্ভ, মধ্যভাগ ও সমাপ্তি থাকা চাই। বক্তৃতার ভাবগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো রূপে আসা দরকার যাতে বক্তৃতার বিষয় বুঝতে শ্রোতাদের কষ্ট না হয়। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "বুয়িসতু বিজাওয়ামিইল কালিম" অর্থাৎ "আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত ভাষণের যোগ্যতাসহ প্রেরণ করা হয়েছে।" আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন শ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর বক্তব্য ছিল প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। ইসলামী সংগঠনের নেতার তাঁরই অনুকরণে সুবক্তা হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

নথিপত্র সংরক্ষণের পারদর্শিতা

নেতাকে হতে হবে নথিপত্র সংরক্ষণে পারদর্শী। নথিপত্রের সঠিক নামকরণ, যথাযথভাবে নাম্বারিং করণ এবং ভেতরে সঠিকভাবে কাগজপত্র সন্নিবেশ করণের যোগ্যতা তাঁর অন্য সকলের চেয়ে বেশি দরকার। নিজে পারদর্শী না হলে অন্যদের দ্বারা এগুলো ভালভাবে করিয়ে নেয়া সম্ভব হয় না। নথিপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষণ না হলে অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের হদিস পাওয়া যায় না, অথবা সেগুলো খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা সময় অপচয় হয়।

হিসাব সংরক্ষণের পারদর্শিতা

নেতা হবেন দক্ষ হিসাব রক্ষক। সংগঠনের যাবতীয় আয় ব্যয়ের রেকর্ড ও হিসাব সঠিকভাবে রক্ষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত। এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতা নেতার অতি বড়ো এক অযোগ্যতা।

ইসলামী নেতৃত্বের প্রধান ভূমিকা

ইসলামী নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে ইসলামী দল আবর্তিত হয়। সৌর জগতের গ্রহগুলো যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে তেমনিভাবে ইসলামী দলের কর্মীবাহিনী নেতাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। সেই কারণেই ইসলামী নেতার কর্মতৎপরতার ব্যাপ্তিও অনেক বেশি।

সৌর জগতের মধ্যমণি সূর্য যদি তার আকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলে তাহলে গোটা সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলো আপন কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তেমনিভাবে ইসলামী নেতা যদি তাঁর আকর্ষণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন তাহলে তাঁর দলের কর্মীগণ তাদের সংঘবদ্ধতার আসল শক্তি হারিয়ে ফেলে হীনবল হয়ে পড়ে।

যদি কোন ইসলামী দল বা রাষ্ট্র এই ধরনের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তাহলে এর পুরো দায়িত্ব এসে পড়ে নেতৃত্বের ওপর। এমন পরিস্থিতির অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ইসলামী নেতাকে সদাসতর্ক থাকতে হয়। সযত্নে পালন করতে হয় তাঁর কর্তব্য। ইসলামী নেতৃত্বকে যেসব ভূমিকা পালন করতে হয় তারই কিছুটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করছি এখানে।

তাযকিয়া

'তাযকিয়া' ইসলামী দলের অন্যতম প্রধান টার্গেট। 'তাযকিয়া' নবী-রাসূলদের কর্মতৎপরতার সাথে বিশেষভাবে অংগীভূত ছিলো। বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাজগুলোর একটি ছিল এই তাযকিয়া বা পবিত্রকরণ প্রচেষ্টা। এ সম্পর্কে সূরা আল জুমুয়াতে আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيِّيْنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِه
وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ـ

“তিনি সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই একজনকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়, তাদেরকে পবিত্র পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ শিক্ষা দেয়।

– আল জুমুয়া ঃ ২

রাসূল হিসাবে অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর আহ্বানে সাড়া দানকারীদের ‘তাযকিয়া’ বা পবিত্রকরণ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুমিনদের চিন্তাধারা ও কর্মধারাকে তিনি পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগত করেছেন। আল্লাহর নির্দেশ পালন করা ছাড়া তাদের জীবনে আর কিছুই প্রিয় ছিল না। তাদের চিন্তা জগতে ছিলো না কোন রকম বিভ্রান্তি। তেমনিভাবে তাদের জীবনধারায় ছিলো না ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর সামান্যতম ছোঁয়াচ। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পছন্দ-অপছন্দ ছিলো তাদের নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের মাপকাঠি। এই ধরনের লোকদের জন্যই সূরা আশ্‌শামসে আল্লাহ বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ـ

“কল্যাণ লাভ করলো সেই ব্যক্তি যে আপন সত্তাকে পবিত্র করে নিলো।”

– আশ্ শামস ঃ ৯

‘তাযকিয়াকে’ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এত বেশি গুরুত্ব দিতেন যে তিনি এই বলে দু‘আ করতেন,

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِىْ تَقْوٰهَا وَزَكِّهَا ـ

“হে আল্লাহ, আমার সত্তাকে তাকওয়া দান করুন এবং একে পবিত্র করুন।”

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবর্তমানে ইসলামের স্বর্ণযুগে আমীরুল মুমিনীনগণ এই মহান কর্তব্য পালন করেছেন নিষ্ঠার সাথে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা এই কর্তব্য পালনে রত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের (রা) জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উমার (রা) আবু লুলু ফিরোজের ছুরির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হন। এই অবস্থায় তাঁকে দুধ পান করানো হলে আঘাতের স্থান দিয়ে সেই দুধ বেরিয়ে আসে। তাঁর বাঁচার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না। বেদনায় তিনি কাতর হয়ে পড়েন। এই কঠিন মুহূর্তে একজন যুবকের ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। যুবকটির পোশাক মাটি পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। তিনি বলেন ঃ

اِرْفَعْ ثَوْبَكَ فَانَّه اَنْقٰى لِثَوْبِكَ وَاَتْقٰى لِرَبِّكَ ـ

"তোমার পোশাক ওপরে ওঠাও। এতে তোমার কাপড় পরিচ্ছন্ন থাকবে আর তোমার রবের কাছে এটা অধিকতর পছন্দনীয়।" – সহীহুল বুখারী

মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার কিছুক্ষণ আগেও তাযকিয়ার এই মহান কর্তব্য পালন করেছেন উমার (রা)।

রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পদাংক অনুসরণ করে আজকের যুগেও ইসলামী নেতৃত্বকে তাঁর দল বা রাষ্ট্রের লোকদের তাযকিয়ার জন্য নিরলস ভূমিকা পালন করতে হবে।

উখুয়াত সৃষ্টি

'উখুয়াত' বা ভ্রাতৃত্ব ইসলামী দলে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মুমিনদের পারস্পরিক গভীর সম্পর্ককে আল্লাহ 'উখুয়াত' নামে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা আল হুজুরাতে আল্লাহ বলেন ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ ـ

"নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" – আল হুজুরাত ঃ ১০

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুগে মাক্কা থেকে আগত মুহাজিরগণ মাদীনার আনসারদের দ্বারা এমনভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন যার কোন তুলনা কোথাও নেই। আনসারগণ মুহাজিরদেরকে তাদের জমি-জমা, ফলের বাগান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নগদ টাকার অংশ প্রদান করেন উদার চিত্তে। আনসারগণ এই মনোভাব দেখাতে ব্যর্থ হলে মাদীনায় মুহাজিরদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠতো।

মুহাজিরদের সাথে আনসারদের রক্তের বন্ধন ছিলো না। বরং রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের কাছ থেকেই মুহাজিরগণ গোপনে সরে পড়ে মাদীনায় এসে পৌঁছেন। রক্তের বন্ধন না থাকলেও ঈমানের যেই বন্ধন আনসারদেরকে মুহাজিরদের সাথে যুক্ত করেছিল তা রক্ত বন্ধনের চাইতেও বেশি মজবুত ছিলো। মুহাজিরদেরকে আকাশের নিচে রেখে আনসারগণ ঘরে ঘুমাতেন না। মুহাজিরদেরকে অভুক্ত রেখে আনসারগণ খেতেন না।

সেটা ছিল আন্তরিকতার যুগ। একজন মুসলিম অন্তর দিয়ে আরেকজন মুসলিমকে বুঝতে চেষ্টা করতেন। আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নয় অন্তরের এই সম্পর্কই সেদিন মুমিনদেরকে "বুনিয়ানুম মারসুস" অর্থাৎ গলিত সিসা দ্বারা গড়া প্রাচীরের মতো মজবুতি দান করেছিলো।

এই সম্পর্কের কারণেই সেই যুগের একজন মুসলিমের ঘরে কোন হাদিয়া এলে তা চলে যেতো প্রতিবেশীর ঘরে। এই সম্পর্কের কারণেই যুদ্ধে আহত অবস্থায় বুকফাটা পিপাসায় কাতর হয়েও পাশে শায়িত ভাইয়ের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে নিজের প্রাপ্য পানিটুকু তাকে দিয়ে দারুন পিপাসা নিয়ে শাহাদাত বরণ করতে পেরেছিলেন সেই যুগের বহু মুমিন। এই সম্পর্কের নাম উখুয়াত।

এই উখুয়াত হচ্ছে সাংগঠনিক শক্তির নির্যাস। এটা যে দল বা রাষ্ট্রে পাওয়া যায় তার শক্তি অনেক। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ـ

"মুমিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি প্রাচীরের মতো। যার একটি অংশ অপর অংশকে মজবুত করে।" – সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى ـ

"পারস্পরিক ভালবাসা, দয়া অনুগ্রহ এবং মায়া মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে

মুমিনগণ একটি দেহের সমতুল্য। যখন দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন গোটা দেহ এর ফলে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"

এই উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয় নেতৃত্বকে।

নেতার অন্তরের উষ্ণতা যখন ছড়িয়ে পড়ে দল বা রাষ্ট্রের সকল স্তরে তখনই উখুয়াত গড়ে উঠে। নেতার অন্তর এই উষ্ণতা ছড়াতে ব্যর্থ হলে শত ওয়াজ নসীহাত করেও উখুয়াত বা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

ত্যাগের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি

ইসলামী সমাজে নেতৃত্বকেই ত্যাগ ও কুরবানীর উদাহরণ পেশ করতে হয় সর্বাগ্রে। নেতার ত্যাগই অনুসারীদেরকে আত্মত্যাগের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেই আদর্শ স্থাপন করেছেন তার কোন নজীর অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন অল্পে তুষ্ট মানুষ। মাদীনা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হয়েও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাতে অনেক টাকা-পয়সা আসতো। তিনি সেসব নিজে ভোগ না করে অন্যদের মাঝে বিলি করে দিতেন। তিনি বলতেন, একজন মুসাফিরের জন্য যেই পরিমাণ পাথেয় দরকার মানুষের জন্য দুনিয়ায় ঠিক ততটুকুই যথেষ্ট।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাপড় কখনো পাট করে রাখা হতো না। অর্থাৎ তাঁর অতিরিক্ত কাপড় ছিলো না যা পাট করে রাখা যেতো।

রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইন্তিকালের পর আয়িশা (রা) বলেন যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, কিন্তু কখনও দুবেলা পেট ভরে খেতে পারেননি।

এই ছিলো মিল্লাতের অবিসম্বাদিত নেতার জীবন-ধারা।

আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই ত্যাগী চরিত্র তাঁকে

তাঁর অনুসারীদের কাছে প্রিয়তম করে তুলেছিলো। নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী হওয়ার কারণে ত্যাগের আহ্বান জানালে তাঁর অনুসারীগণ ত্যাগের প্রতিযোগিতায় লেগে যেতেন। তাঁর নিস্বার্থ জীবন-যাত্রা অন্যদের জন্য প্রেরণার উৎস ছিলো। তাঁর সাহচর্য লাভ করে গড়ে ওঠেছিলো একটি নির্লোভ ও নিস্বার্থ জনগোষ্ঠী। সাদাসিধে জীবন যাপনের উৎসাহ দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الاِيْمَانِ -

"আড়ম্বরহীনতা ঈমানের অঙ্গ।" – সুনানু আবী দাঊদ

বস্তুতঃ অনাড়ম্বর ও ত্যাগী জীবন যাপনকারী নেতার বিরুদ্ধে তাঁর অনুসারীদেরকে কখনও বিক্ষুব্ধ হতে দেখা যায় না। রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কথাটি আরো বেশি সত্য। কোন রাষ্ট্রে যদি কখনো দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয় এবং দেশের মানুষ যদি একবেলা খেয়ে দিন কাটাতে বাধ্য হয় সেই সময়টাতেও রাষ্ট্রের নাগরিকগণ বিদ্রোহী হয় না যদি তারা দেখতে পায় যে, তাদের নেতা তাদের মতোই একবেলা খাচ্ছেন এবং তাদের মতোই কষ্ট স্বীকার করছেন। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রের নাগরিকগণ বরং নেতার সাথে একাত্ম হয়ে ধৈর্য সহকারে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন নিজের জীবনকেই উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করে তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে ত্যাগী জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, আজকের দুনিয়ার যেই কোন ইসলামী দল বা রাষ্ট্রের নেতাকে একই নিয়মে তাঁর অনুসারীদেরকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। ত্যাগের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির এটাই স্বাভাবিক পথ।

কর্মীদের মাঝে ইনসাফ কায়েম

একটি দলে থাকে নানা রকমের মানুষ। কর্ম-ক্ষমতা, বুদ্ধি-মত্তা এবং দৈহিক সৌন্দর্যের দিক থেকে এদের মাঝে থাকে অনেক পার্থক্য। এসব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য তাদের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করার জন্য এগিয়ে আসে তাদের সবার অধিকার সমান।

কালো, ধলো, কুৎসিৎ, সুদর্শন, কম বুদ্ধিমান, বেশি বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান, প্রতিভাহীন, বলবান, বলহীন এরা সবাই অধিকারের সমান অংশীদার।

কালো, কুৎসিৎ, কম বুদ্ধিমান, প্রতিভাহীন বা বলহীন হওয়ার কারণে নেতা যদি কাউকে হেয় জ্ঞান করেন তাহলে তো তিনি বড় রকমের অপরাধই করে বসেন। আবার সুদর্শন, বেশি বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান বা বলবান হওয়ার কারণে যদি কারো প্রতি বেশি অনুরাগী হন তাহলে তিনি দলের মৃত্যুঘণ্টা বাজাতেই শুরু করেন। কালো, কুৎসিৎ, কম বুদ্ধিমান, প্রতিভাহীন বা বলহীনকে বাঁকা চোখে দেখার অর্থ স্রষ্টাকে বাঁকা চোখে দেখা। কারণ স্রষ্টাই কিছু লোককে কালো, কুৎসিৎ, কম-বুদ্ধিমান, প্রতিভাহীন বা বলহীন রূপে সৃষ্টি করেছেন, তারা নিজেরা নিজেদেরকে এভাবে সৃষ্টি করেনি।

নেতার কর্তব্য সবাইকে ভালোবাসা। তিনি তাদের সবাইকে শুধুমাত্র এই জন্যই ভালোবাসবেন যে, তারা আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে নিবেদিত-প্রাণ।

আল্লাহর প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হওয়ার কারণে মুমিনদের মাঝে যেই ভালোবাসা গড়ে ওঠে, কেবলমাত্র এটাই আল্লাহর নিকট স্বীকৃত ভালোবাসা, অন্য কোন ভালোবাসা নয়।

ইনসাফের দাবী হচ্ছে নেতা কর্মীদেরকে সমান চোখে দেখবেন, প্রত্যেকের প্রতি সমান মনোযোগ দেবেন, প্রত্যেকের আপনজনে পরিণত হবেন, প্রত্যেককেই তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেবেন এবং কাজ আদায় করে নেবেন।

নেতার কথা ও আচরণ থেকে যদি কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি অনুরাগ এবং কিছু সংখ্যক লোকের প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ পায় তাহলে তাঁর নেতৃত্ব তাঁর দল বা রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই ডেকে আনে।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالاِحْسَانِ -

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারক এবং সদাচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।"

– আন্ নাহল ঃ ৯০

আল্লাহর নির্দেশের এই দাবী অনুযায়ী দল বা রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েম না করে, একজন নেতা মানুষের কাছে এবং মানুষের রবের কাছে সমাদৃত হবেন, এটা কখনো আশা করা যায় না। নেতা তাঁর কর্মীদের প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে ব্যর্থ হলে তাঁর দল বা রাষ্ট্রের ভিত দুর্বল হতে থাকে। এক পর্যায়ে তা ভূমিধসের ভয়াবহতার সম্মুখীন হয়। এই অনভিপ্রেত পরিবেশ থেকে দল বা রাষ্ট্রকে হিফাযাত করার প্রয়োজনে নেতাকে অবশ্যই ইনসাফপূর্ণ আচরণ তাঁর প্রাত্যহিক কাজকর্মের অন্যতম মূলনীতিতে পরিণত করতে হবে।

বিপদ মুসিবাতে ছবর অবলম্বনের তা'লীম

এই দুনিয়ায় মুমিনদের চলার পথ মোটেই ফুল-বিছানো নয়। আল্লাহ মুমিনদের ওপর কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই কঠিন দায়িত্ব পালনে সফলতা অর্জন করতে পারলে আল্লাহ তাদের জন্য নির্ধারিত রেখেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামাত–জান্নাত।

জান্নাতের মতো মূল্যবান স্থানে মুমিনদেরকে উন্নীত করার আগে আল্লাহ তাদেরকে উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন, এটাই স্বাভাবিক। এই উপযুক্ততা প্রমাণের ক্ষেত্র হচ্ছে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

এই সংগ্রাম পরিচালনা করতে গিয়ে মুমিনদেরকে বিভিন্ন জটিলতা, সংকট এবং বিপদ মুসিবাতের মুকাবিলা করতে হয়। মুমিনদের সামনে এগুলো আসে পরীক্ষারূপে। এই সম্পর্কে সূরা আল বাকারায় আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الاَمْوَالِ وَالاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ -

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়ভীতি (ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি), ক্ষুধা এবং মাল, জান ও ফল-ফসলের ক্ষতি দ্বারা। আর ছবর অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দাও।" – আল বাকারা ঃ ১৫৫

সূরা আল আনকাবুতে আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وهُمْ لاَ يُفْتَنُوْنَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ -

"মানুষেরা কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং কোন পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরীক্ষা করেছি। ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী আল্লাহ অবশ্যই তা জেনে নেবেন।"

– আল আনকাবুত ঃ ২৩

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ বলেন,

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ -

"তোমরা কি ভেবেছো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এই বিষয়ে এখনো দেখেননি যে, তোমাদের কারা জিহাদে আত্মনিয়োগ করে এবং ছবর অবলম্বন করে।" – আলে ইমরান ঃ ১৪২

এসব কথার মাধ্যমে আল্লাহ যেই কথাটি মুমিনদের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চান তা হচ্ছে এই যে, জান্নাত প্রাপ্তি সহজ ব্যাপার নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার রঙ্গীন স্বপ্ন বাদ দিয়ে পরিপূর্ণ আত্মত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েই মুমিনগণ জান্নাত প্রাপ্তির আশা করতে পারে।

দীন-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাধার চড়াই উতরাই পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। চলার পথে বিভিন্ন মানযিলে নেমে আসে প্রতিবন্ধকতা। সমালোচনা, বিদ্রূপ, প্রলোভন এবং দৈহিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয় বার বার। এসব কিছুকে উপেক্ষা করে সামনে চলা নিশ্চয়ই কঠিন। সমালোচনা ও বিদ্রূপ-বাণের সামনে মনোবল বাঁচিয়ে রাখা, বিভিন্ন রকমের প্রলোভনের হাতছানি থেকে আত্মরক্ষা করা এবং যাবতীয় নির্যাতন সহ্য করা চাট্টিখানি কথা নয়।

এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে দুর্বলচেতা মুমিনদের কিছু সংখ্যক পিছুটান দেয়, কিছু সংখ্যক লোক গৃহীত সিদ্ধান্তের দুর্বলতা আবিষ্কারের জন্য গবেষণায় লেগে যায় এবং কিছু লোক পথটিই সঠিক কিনা সেই সংশয়ে পড়ে যায়। কিন্তু যাদের ঈমানের কোন ঘাটতি নেই, মনে কোন ব্যাধি নেই এবং আল্লাহর সন্তোষের জন্য জীবন দিতে যারা অকুতোভয় তারা এই পরীক্ষাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। তারা বাধার প্রতিটি প্রাচীরকেই এক একটি নতুন পরীক্ষা হিসাবে গ্রহণ করে এবং এই পরীক্ষাগুলোতে কামিয়াব হওয়ার জন্য কেবলমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ওপরই নির্ভর করে।

মুসলিম মিল্লাতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কঠিন বিপদ মুসিবাতের পরই মিল্লাতের চিন্তা-জগতে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে এবং মিল্লাতের বিরাট অংশ সংগ্রামী চেতনা অবদমিত করে বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করেছে। আজকের যুগে ইসলামী পুনর্জাগরণের পথে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বৈরাগ্যবাদ।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্যতম বিশেষ গুণ হচ্ছে ছবর। ছবর বলতে কেবল নীরবে নানাবিধ যাতনা সহ্য করাকেই বুঝায় না। আল্লাহর সিদ্ধান্তকে অকাতরে মেনে নেয়া এবং সর্ববিধ বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত থাকাও এর মধ্যে শামিল। ইসলামী নেতা এবং তাঁর অনুগামীদেরকে অবশ্যই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তির জীবনে কোন মুসিবাত আসতে পারে না। এই ক্ষেত্রে সূরা আল হাদীদে আল্লাহ যেই ঘোষণাটি রেখেছেন তা ভালভাবে মনে রাখা দরকার।

আল্লাহ বলেন ঃ

مَا اَصَابَ مِنْ مُصِيْبَةٍ فِى الاَرْضِ وَلاَ فِىْ اَنْفُسِكُمْ الاَّ فِىْ كِتٰبٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا - اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ -

"দুনিয়ায় এবং তোমাদের ব্যক্তিসত্তায় এমন কোন মুসিবাত ঘটতে পারে না যা ঘটার আগেই আমি একটি কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ।" – আল হাদীদ ঃ ২২

বিপদ মুসিবাতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। তার চেয়েও কঠিন কাজ বিপদ-উত্তরকালে বিভ্রান্তি থেকে দলকে বাঁচিয়ে রাখা। প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব অথবা ব্যর্থতা প্রমাণিত হয় এখানেই। নেতা যদি সত্যিকার অর্থে ছবর অবলম্বন করতে পারেন, তবেই তো তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ছবর সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে পারেন। নেতা যদি নিজে চিন্তার বিভ্রান্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন তবেই তো তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে সেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালাতে পারেন।

আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই সকল তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু রূপে উপস্থাপন

ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের কর্মক্ষেত্র দুনিয়া। এই দুনিয়ার চেহারা পাল্টানোর দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তিত করে ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা কায়েমের জন্যই তারা চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করাই নয় বরং ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনই তাদের লক্ষ্য।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দুনিয়াবী দৃষ্টিতে কামিয়াব নাও হতে পারে। আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নবী নূহ (আলাইহিস সালাম) সাড়ে ন'শ বছর ধরে দুনিয়ার বুকে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন। এমন নয় যে তাঁর নেতৃত্ব দুর্বল ছিলো অথবা তিনি ভালো স্ট্র্যাটেজিষ্ট ছিলেন না। বস্তুতঃ যেই জাতি ইসলামী সমাজের মতো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সম্পদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় আল্লাহ সেই জাতিকে খামাখাই তা দান করেন না। নূহ (আলাইহিস সালাম)এর কাওমকেও আল্লাহ তা দান করেননি। এর অর্থ এই নয় যে, নূহ (আলাইহিস সালাম)এর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। সেই দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করে গেছেন। পরিণামে তিনি আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করেছেন । কাজেই তাঁর জীবনে কোন ব্যর্থতা নেই।

আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীগণ তাদের সমগ্র তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে, তখন দুনিয়াবী কোন ব্যর্থতাই

তাদের মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। তারা হতাশ হয় না। দুনিয়ার বুকে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের প্রতাপ দেখে তারা বিচলিত হয় না। বরং স্মরণ করে আল্লাহর বাণী–

لاَ يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِى الْبِلاَدِ - مَتَاعٌ قَلِيْلٌ ثُمَّ مَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ -

"যমীনে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সদর্প পদচারণা তোমাকে যেন প্রবঞ্চিত না করে। এটি অতি সামান্য উপভোগের উপকরণ। তাদের চূড়ান্ত নিবাস জাহান্নাম যা অত্যন্ত খারাপ এক শয্যা।" – আলে ইমরান ঃ ১৯৬

মুমিনদের দৃষ্টি সঠিক দিকে নিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ সূরা আলে ইমরানের অন্যত্র বলেন,

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

"দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের মাগফিরাতের দিকে এবং জান্নাতের দিকে যার ব্যাপ্তি সমগ্র আসমান ও পৃথিবীর সমান। মুত্তাকীদের জন্যই তা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।" – আলে ইমরান ঃ ১৩৩

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পরিচালিত সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ কোন্ মহান লক্ষ্যকে তাঁদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়েছিলেন তা সূরা আল ফাতহের একটি আয়াতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে–

يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا -

"তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তোষ অন্বেষণ করে থাকে।" – আল ফাত্হ ঃ ২৯

বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তোষ অর্জনই হচ্ছে মুমিন জীবনের যাবতীয় তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু।

মুমিনদের তৎপরতা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে লক্ষ্য করেই

পরিচালিত হোক, এটাই আল্লাহ চান। এক্ষেত্রে নিয়াতের বিশুদ্ধতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাদীস থেকে জানা যায় যে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার মতো বড়ো রকমের কুরবানীও আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না যদি তা বিশুদ্ধ নিয়াত সহকারে না করা হয়।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে, শেষ বিচারের দিন সর্বপ্রথম একজন শহীদের বিচার ফায়সালা হবে। তাকে হাজির করে তার প্রতি প্রদত্ত সকল নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সেই ব্যক্তি এসব নিয়ামাত-প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "এসব উপভোগের পর তুমি কি করেছো?' সে বলবে, 'আমি শহীদ না হওয়া পর্যন্ত আপনার পথে লড়াই করেছি?' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি বীররূপে খ্যাত হবার জন্য লড়াই করেছো। সেই খ্যাতি তুমি পেয়েও গেছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টানা হবে যেই পর্যন্ত না সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যে ইলম অর্জন করেছে, ইলম শিক্ষা দিয়েছে এবং আল-কুরআন পড়েছে। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সেই ব্যক্তি এসব নিয়ামাত প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, এসব ভোগের পর তুমি কি করেছো? সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা দিয়েছি আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য আল কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি আলিম (বা বিদ্বান) রূপে খ্যাত হবার জন্য ইলম অর্জন করেছো। তাপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টানা হবে যেই পর্যন্ত না সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।

এরপর হাজির করা হবে এমন এক ব্যক্তিকে যাকে আল্লাহ সচ্ছলতা ও ধন সম্পদ দান করেছেন। তাকে তার প্রতি প্রদত্ত নিয়ামাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হবে। সে এসব নিয়ামাত-প্রাপ্তি ও ভোগের কথা স্বীকার করবে। তাকে

জিজ্ঞাসা করা হবে, এসব উপভোগের পর তুমি কি করেছো? সে বলবে, আমি আপনার পছন্দনীয় সব কাজেই আমার সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যে বলছো। তুমি দাতারূপে খ্যাত হবার জন্যই দান করেছো। সেই খ্যাতি তুমি অর্জনও করেছো। তারপর ফায়সালা দেয়া হবে এবং তাকে উপুড় করে পা ধরে টানা হবে যেই পর্যন্ত না সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়।"

একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে লক্ষ্য স্থির না করে বা সেই লক্ষ্যের সাথে আরো কিছু লক্ষ্যকে শরীক করে যত বড়ো কাজই করা হোক না কেন, তা পণ্ডশ্রম মাত্র। ইসলামী দলের কর্মীবাহিনী যাতে এই দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত না হয় তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেতৃত্বের। বস্তুতঃ আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের দিকে অনুগামীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে নেতৃত্বের সবচে বড়ো কৃতিত্ব।'

ইসলামী নেতৃত্ব দলের সদস্যদের নিকট থেকে দূরে অবস্থান করেন না। তিনি তাদের মাঝে থাকেন এবং তাদেরই একজন হয়ে থাকেন। তিনি তাদের প্রশ্নকে ভয় করেন না। যেই কোন প্রয়োজনীয় ও শালীন প্রশ্নের জওয়াব দিতে সদা প্রস্তুত থাকেন। তিনি তাঁর যাবতীয় কাজের জন্য সাধারণভাবে সদস্যদের এবং বিশেষভাবে মাজলিসে শুরার নিকট দায়ী থাকেন।

ইসলামী দল, সমাজ বা রাষ্ট্রের নেতার দায়িত্ব দ্বিমুখী। একদিকে তাঁকে দায়ী থাকতে হয় নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে। অন্যদিকে তাঁকে দায়ী থাকতে হয় আল্লাহর কাছে। বস্তুতঃ দুনিয়ার জওয়াবদিহির চেয়ে তাঁর আখিরাতের জওয়াবদিহি ভীষণতর। এই সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পূর্বাহ্নেই সাবধান করে বলেছেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مسْؤُوْلٌ عنْ رعِيَّته اَلامَامُ رَاعٍ ومسْئُوْلٌ عنْ رعِيَّتِهِ -

“তোমাদের প্রত্যেকেই তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার তত্ত্বাবধান-দায়িত্ব সম্পর্কে জওয়াবদিহি করতে হবে। নেতা একজন তত্ত্বাবধায়ক এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”

– সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

اَيُّمَا وَالٍ وَلِّى مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ شيْئًا فَلَمْ يَنْصح لَهُمْ وَلَمْ يجْهَدْ لَهُمْ كَنُصْحه وجُهْده لنَفْسِهِ كَبَّهُ اللّٰهُ عَلىٰ وجْهِهِ فِى النَّارِ -

“যেই ব্যক্তি মুসলিমদের সামষ্টিক ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, পরে তার দায়িত্ব পালনে সৎ মনোভাব প্রদর্শন করেনি এবং এই কাজে সে নিজেকে এভাবে নিয়োজিত করেনি যেভাবে সে নিজেকে নিয়োজিত করে নিজের কাজে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।”

নেতার আনুগত্য ইসলামী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের ওপর অবশ্য কর্তব্য। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اَطِيْعُوا اللّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الاَمْرِ مِنْكُمْ -

"মুমিনগণ, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্য থেকে যে উলুল আমর তার আনুগত্য কর।" – আন নিসা ঃ ৫৯

আল্লাহর রাসূল বলেন,

مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهَ ومَنْ عصَانِىْ فَقَدْ عصى اللّهَ ومَنْ يُطِعِ الاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِى ومَنْ يَّعْصِ الاَمِيْرَ فَقَدْ عصَانِى -

"যেই ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। যেই ব্যক্তি আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহ্কেই অমান্য করলো। আর যেই ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। যেই ব্যক্তি আমীরের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।" – সহীহুল বুখারী

اسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبشِىٌّ كَاَنَّ رَأسَهُ زَبِيْبَةٌ -

"তোমরা শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর যদিও তোমাদের ওপর কোন হাবশী গোলামকেও কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তার মাথা দেখতে আংগুরের মতো (ছোট) হয়।"

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِى عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ ومَنْشَطِكَ ومَكْرهِكَ اَثَرَةٍ عَلَيْكَ -

"সহজ অবস্থায় ও কঠিন অবস্থায় এবং সন্তুষ্টিতে ও অসুন্তুষ্টিতে তথা তোমার অধিকার নস্যাৎ হওয়ার ক্ষেত্রেও শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা তোমার কর্তব্য।" – সহীহ্ মুসলিম

مَنْ كَرِهَ مِنْ اَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ -

"তোমাদের কেউ যদি তার আমীরের মধ্যে কোনরূপ অপ্রীতিকর বিষয় লক্ষ্য করে, সে যেন ধৈর্য ধারণ করে।" –সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম

সালামাহ ইবনে ইয়াযিদ আল জুফী (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন,

سَأَلَ سَلَمَةُ ابْنُ يَزِيْدِ الْجُعْفِى رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰه اَرَأَيْتَ اِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا اُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَاَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَه فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ -

"হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের ওপর যখন এমন আমীর ক্ষমতায় আসীন হবে যারা তাদের অধিকার আমাদের নিকট থেকে পুরোপুরি আদায় করে নিতে চাইবে এবং আমাদের অধিকার দেবে না তখন আমরা কি করবো? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রতি (প্রশ্নকর্তার) ভ্রূক্ষেপ করলেন না। সালামাহ আবার জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবার বললেন, "তোমরা শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করে যাবে। কারণ তাদের বোঝা তাদের ওপর। তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপর।" – সহীহ্ মুসলিম

আনুগত্যের মূল অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। আনুগত্যের দ্বিতীয় অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আর তৃতীয় অধিকারী হচ্ছেন সংগঠনের আমীর।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য নিঃশর্ত। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ কী তা জানার পর বিনা বাক্য ব্যয়ে তা পালন করাই মুমিনের কর্তব্য। আমীরের নির্দেশ যদি আল্লাহ

ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তাও পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে পালন করতে হবে। কিন্তু তাঁর কোন নির্দেশ যদি আল্লাহ ও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তা পালন করা যাবে না। এই সম্পর্কে আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষা হলো ঃ

اَلطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ ـ

"আনুগত্য কেবল মারূফ কাজে।" –সহীহুল বুখারী

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ـ

"স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন সৃষ্টির আনুগত্য করা চলবে না।"

اَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَّالَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَاذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ

"গুনাহর নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নেতার নির্দেশ শ্রবণ ও পালন প্রত্যেকের জন্য অবশ্য কর্তব্য। গুনাহর নির্দেশ দেয়া হলে আনুগত্য পাওয়ার অধিকার তার নেই।" – সহীহুল বুখারী

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيْمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ الاَّ اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاذَا اُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ ـ

"প্রত্যেক মুসলিমের ওপর নেতার নির্দেশ শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা অবশ্য কর্তব্য–চাই তা পছন্দ হোক বা অপছন্দ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হয়। আল্লাহর নাফরমানীর নির্দেশ দেয়া হলে তা শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা যাবে না।" – সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

সংগঠনের শৃঙ্খলার উপাদান হচ্ছে আনুগত্য। যেই সংগঠনে আনুগত্য নেই সেই সংগঠনে শৃঙ্খলা নেই। আর শৃঙ্খলাই যদি না থাকে তাহলে সংগঠনে বহুলোকের ভীড় জমলেও এর কোন মূল্য হয় না।

একটি সংগঠন তখনই কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে পারে যখন এর কর্মীবাহিনী নেতার নির্দেশকে সেভাবে পালন করে যেভাবে সেনাবাহিনীর জওয়ানেরা তাদের কমাণ্ডারের নির্দেশ পালন করে থাকে।

আল্লাহর বিচারালয়ে নেতার জওয়াবদিহি একজন সাধারণ মুমিনের জওয়াবদিহির চেয়ে কঠোরতর হবে। এই জওয়াবদিহি সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে সচেতন কোন ব্যক্তি নেতৃত্বের পদ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে, এটা স্বাভাবিক নয়। যদি কোন ব্যক্তির কথা ও আচরণ থেকে প্রমাণিত হয় যে নেতৃত্ব পদের প্রতি তার লোভ রয়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে সেই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত।

একমাত্র আত্মপূজারী বা স্বার্থান্ধ ব্যক্তিই ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব পদ লাভের জন্য প্রার্থী হতে পারে। এই ধরনের কোন ব্যক্তি যাতে ইসলামী সংগঠনের কোন পদ পেতে না পারে সেই ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সদা-সতর্ক ছিলেন।

يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الاِمَارَةَ - فَانَّكَ اِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ اُعِنْتُ عَلَيْهَا، وَاِنْ اُعْطِيْتَهَا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِّلْتَ الَيْهَا -

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "হে আবদুর রহমান ইবনু সামুরাহ, নেতৃত্ব পদ প্রার্থী হয়ো না। কারণ প্রার্থী না হয়ে নেতৃত্ব প্রদত্ত হলে তুমি এই ব্যাপারে সহযোগিতা পাবে। আর প্রার্থী হয়ে নেতৃত্ব পদ পেলে তোমার ওপরই যাবতীয় দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।" – সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম

انَّا وَاللّه لاَ نُوَلِّى عَلىٰ هٰذَا الْعَمَلِ اَحَدًا سَأَلَهُ وَلاَ اَحَدًا حرص عَلَيْه -

"আল্লাহর শপথ, আমরা এমন কোন লোকের ওপর এই কাজের দায়িত্ব

অর্পণ করবো না যে এর জন্য প্রার্থী হয় অথবা অন্তরে এর আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে।" – সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম

পদ-লোভী সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে নেতৃত্ব পদে আসীন হবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই লোভ যখন মাত্রাতিরিক্ত হয় তখন সে পরোক্ষ ভূমিকা বাদ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে নেমে পড়ে। নিজেকে নেতা ঘোষণা করে সে লোকদেরকে তার নিকট বাইয়াত হওয়ার আহ্বান জানায়।

খুলাফায়ে রাশিদীনের পর মুসলিম উম্মাহ্ এই ধরনের দুঃখজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। স্বঘোষিত নেতাদের হাতে পড়ে মুসলিম উম্মাহ্কে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

মুসলিম উম্মাহ্ যে পরবর্তী যুগগুলোতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবীগণকে এই সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এই ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য কী পদক্ষেপ নেয়া বাঞ্ছনীয় তাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

وَسَيَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُوْنَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ اَوْفُوْا بَيْعَةَ الاَوَّلِ فَالاَوَّلُ -

"অচিরেই আমার পরে বেশ কিছু সংখ্যক খালীফা হবে।" সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তখনকার জন্য আমাদের প্রতি আপনার কী নির্দেশ?" তিনি বললেন, "যথাক্রমে একজনের পর আরেকজনের বাইয়াত পূর্ণ করবে।" – সহীহুল বুখারী, সহীহ্ মুসলিম

اِذَا بُوْيِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الاٰخِرَ مِنْهَا -

"যখন দু'জন খালীফাহর জন্য বাইয়াত গ্রহণ করা হয়, তখন যার বাইয়াত শেষে গ্রহণ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে লড়াই কর।" – সহীহ্ মুসলিম

وَمَنْ بَايَعَ اِمَامًا فَاَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ اِنِ اسْتَطَاعَ فَاِنْ جَاءَ اٰخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَ الاٰخَرِ -

“এবং কেউ যদি নেতার নিকট বাইয়াত করে, তার হাতে হাত রেখে এবং তার নিকট অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করে, তাহলে সে যেন সাধ্যমতো আনুগত্য করে। অপর কোন ব্যক্তি যদি মুকাবিলায় আত্মপ্রকাশ করে তাহলে অপর জনের ঘাড় মটকে দাও।” – সহীহ্ মুসলিম

আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই বাণী থেকে বুঝা গেল যে, পদলোভী ব্যক্তিকে নেতৃত্ব পদে বরণ করে নেয়া যাবে না। তেমনিভাবে ইসলামী সংগঠন বা রাষ্ট্রের জনসমর্থনপুষ্ট একজন আমীর বর্তমান থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে আমীর স্বীকার করা যাবে না। স্বীকার করাতো দূরে থাক, এই ধরনের ব্যক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

পদলোভী ব্যক্তি দল বা রাষ্ট্রের নেতৃত্ব পদ লাভ করলে সে তা বিনাশই করে ছাড়ে। তদুপরি সে তার আখিরাতও বরবাদ করে। এই সম্পর্কেই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

انَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ عَلَى الاِمَارَةِ فَسَتَكُوْنَ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

“অচিরেই তোমরা নেতৃত্ব পদের অভিলাষী হয়ে পড়বে। আর কিয়ামাতের দিন এটা তোমাদের জন্য লজ্জা ও দুঃখের কারণ হবে।” – সহীহুল বুখারী

ইসলামী সংগঠনে পরামর্শ

পরামর্শ নেয়া ও পরামর্শ দেয়া ইসলামী সংগঠনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সামষ্টিক কাজ কর্মে আসহাবে কিরামের সাথে পরামর্শ করার জন্য রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَشَاوِرْهُمْ فِى الاَمْرِ - فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰه -

"কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। কোন বিষয়ে তোমার মত সুদৃঢ় হয়ে গেলে আল্লাহর ওপর ভরসা কর।" – আলে ইমরান ঃ ১৫৯

মুমিনদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ -

"তাদের সামষ্টিক কাজ-কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়।"
– আশ্ শূরা ঃ ৩৮

যেই বিষয়ে একাধিক ব্যক্তির সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে সেই বিষয়ে কোন একজনের এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এক ধরনের বাড়াবাড়ি। কোন বিষয়ে যতো মানুষের স্বার্থ জড়িত আছে ততো মানুষের সাথে পরামর্শ করাই বাঞ্ছনীয়। সংশ্লিষ্ট লোকের সংখ্যা যদি খুব বেশি হয় তাহলে তাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক।

কোন মানুষ সামষ্টিক ব্যাপারগুলোতে স্বেচ্ছাচারিতা চালানোর চেষ্টা হয়তো এই জন্য করে যে, সে নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্য অন্যের অধিকার হরণ করতে চায় অথবা সে নিজেকে বড়ো এবং অন্যকে ছোট মনে করে। এই দু'ধরনের মনোভাবই খারাপ। মুমিন চরিত্রে এই ধরনের মনোভাব যেন প্রবেশ করতে না পারে তারই জন্য ইসলাম পারস্পরিক পরামর্শকে সামষ্টিক জীবনের অপরিহার্য শর্ত বানিয়ে দিয়েছে।

যেসব বিষয় অপরের স্বার্থ ও অধিকারের সাথে জড়িত সেগুলোর ফায়সালা করা অতি বড়ো এক দায়িত্ব। আখিরাতে জওয়াবদিহির অনুভূতি যার আছে তিনি এমন বিষয়গুলোতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে পরামর্শ করার চেষ্টা অবশ্যই করবেন যাতে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে অসতর্কভাবে কোন ক্রুটি ঘটলেও কোন এক ব্যক্তির উপর তার দায় দায়িত্ব না পড়ে।

মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে লোকেরা পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে। মানুষের মুখ বন্ধ করে তাদের হাত-পা বেঁধে তাদেরকে অন্ধকারে রেখে সামষ্টিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা বড়ো রকমের যুল্‌ম।

ঐকমত্যের ভিত্তিতে যেই পরামর্শ দেয়া হয় অথবা যা অধিকাংশ ব্যক্তির মত হয় তা মেনে নেয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন ব্যক্তি যদি সকলের মত পাওয়ার পর স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করে তাহলে পরামর্শ করার নীতি কার্যতঃ অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেবল পরামর্শ নিলেই হয় না। পরামর্শের পর সর্বসম্মতভাবে অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে যেই সিদ্ধান্ত হবে সেই অনুযায়ী ব্যাপারসমূহ সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

আরো একটি মৌলিক কথা মনে রাখা দরকার। মুসলিমদের ব্যাপারসমূহ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে মাজলিসে শূরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী নয়। পরামর্শ দীন ইসলামের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যেই হতে হবে। মুসলিমগণ শারীয়াহর ব্যাপারে পরামর্শ করবে কোন বিধানের সঠিক তাৎপর্য বুঝার জন্য এবং তা কার্যকর করার লক্ষ্যে সর্বোত্তম পন্থা নির্ধারণ করার জন্য। যেসব বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চূড়ান্ত ফায়সালা দিয়েছেন সেসব বিষয়ে মাজলিসে শূরা স্বাধীনভাবে কোন নতুন ফায়সালা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারে না।

মাজলিসে শূরা বা পরামর্শ সভার সদস্যগণ মুক্ত মন নিয়ে সভায় সমবেত হবেন। তাঁরা পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণা নিয়ে সভায় আসবেন না।

পরামর্শ দাতাগণ নিজেদের ঈমান, ইলম ও নিরপেক্ষ চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী মত ব্যক্ত করবেন। কোন লোভে পড়ে, কোন ভয়ে ভীত হয়ে অথবা কোন্দলে পড়ে নিজের প্রকৃত মনোভাবের বিপরীত মত ব্যক্ত করবেন না।

একে অপরের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনবেন এবং বক্তব্যের সঠিক অর্থ বুঝবার চেষ্টা করবেন।

প্রত্যেক সদস্য নিজের অভিমত নিঃসংকোচে ব্যক্ত করবেন।

প্রত্যেক সদস্যই অধিকতর উত্তম অভিমতের মুকাবিলায় নিজের অভিমত কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকবেন।

প্রত্যেকেই একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের দিকে এগুবার চেষ্টা চালাবেন।

কখনো যদি এমনটি হয়ে যায় যে, মাজলিসে শূরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অভিমতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বুনিয়াদ বানাতে হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে যাঁরা দ্বিমত পোষণ করবেন তাঁরাও মাজলিসে গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ করবেন এবং কোনভাবেই তাঁদের দ্বি-মত পোষণের কথা মাজলিসের বাইরের কাউকে জানাবেন না।

ভিন্নমত পোষণকারীগণ আমীরের মাধ্যমে পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য মাজলিসে শূরাকে অনুরোধ জানাতে পারেন। কিন্তু মাজলিসে শূরার অধিকাংশ সদস্য সিদ্ধান্ত বহাল রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত

করলে ভিন্নমত পোষণকারীগণকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজেই মন দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের আলোচনা এমন পর্যায়েও পৌছতে পারে যখন আমীর কিছুতেই মাজলিসে শূরার অধিকাংশ সদস্যের মতের সাথে একমত হতে পারেন না। এমতাবস্থায় সিদ্ধান্ত মুলতবী রেখে আমীর বিষয়টি সদস্য মণ্ডলীর নিকট পেশ করবেন।

সদস্য মণ্ডলী উভয় মত বিবেচনা করে যেটাকে অধিকতর উত্তম ও কল্যাণকর বলে রায় দেবেন আমীর এবং মাজলিসে শূরার সদস্যগণ বিনা দ্বিধায় তা মেনে নেবেন।

এই যুগে কোন নবী নেই। নবীর গড়া কোন মানুষও নেই।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদেরকেই আজ ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে ঈমানের দাবী পূরণের জন্য। কিন্তু আমাদের জীবনে আছে ভুলভ্রান্তি।

কোন মুমিন সারা জীবন ভুল-ভ্রান্তির আবর্জনায় গড়াগড়ি দিতে থাক, এটা আল্লাহ্ চান না। তাই তিনি মুমিনদেরকে তাদের চিন্তা-ভাবনা, কথাবার্তা, লেন দেন ও যাবতীয় কাজ কর্মের তাযকিয়া কাজে মনোযোগী হতে উৎসাহিত করেছেন।

মুমিনগণ যাতে একে অপরের ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দেয় তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اَلْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ

"মুমিন মুমিনের আয়না।" – সুনানু আবী দাউদ

আয়না যেভাবে একজন ব্যক্তিকে তার সাজগোছে কোথায় কোন ত্রুটি আছে তা দেখিয়ে দেয়, একজন মুমিনও সেভাবে আরেকজন মুমিনের জীবনে কোথায় কী ত্রুটি আছে তা দেখিয়ে দেবে।

সাধারণতঃ অবচেতনভাবেই মানুষ ভুল করে। কেউ যদি এই ব্যাপারে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবেই সে সচেতন হয়ে তার জীবন থেকে ভুল-ভ্রান্তি দূর করার পদক্ষেপ নিতে পারে।

একে অপরের ভুল ভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়ার এই প্রক্রিয়ারই নাম ইহতিসাব।

ভুল দেখিয়ে দেয়ার একটা বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা খুবই জরুরী। তা না হলে হিতে বিপরীত হবার সমূহ আশঙ্কা।

ইহতিসাব ব্যক্তিগতভাবে করাই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগতভাবে ভুলভ্রান্তি দেখিয়ে দেয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজেকে শুধরাতে উদ্যোগী না হয় তাহলে সামষ্টিক ফোরামে বিষয়টি আনা যাবে।

ইহতিসাবের আগে ব্যক্তির মানসিক অবস্থা জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়। কঠিন সমস্যা-পীড়িত মানুষ কোন প্রকারের সমালোচনা বরদাশত করতে পারে না অথবা যথার্থ মিজাজে সমালোচনা গ্রহণ করতে পারে না। সেই জন্য ব্যক্তির মানসিক অবস্থা যাচাই করে নেয়া দরকার।

ইহতিসাবের ভাষা হবে মোলায়েম। ভাষায় কোন তেজ থাকবে না। ক্ষোভের অভিব্যক্তি ঘটবে না।

ইহতিসাব যে করবে তার চেহারা ও ভাব-সাবে রাগ ও ক্ষোভ প্রকাশ পাবে না। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন বুঝতে সক্ষম হয় যে তার ত্রুটি দেখিয়ে দেয়ার লক্ষ্য, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয় বরং তার জীবনকে সুন্দর করা।

ইহতিসাব মাথা পেতে নেয়া নিশ্চয়ই বাহাদুরীর কাজ। কোন কাপুরুষের পক্ষে ইহতিসাবের মুকাবিলায় মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু ইসলামী সংগঠনের কর্মীগণ এই ধরনের কাপুরুষতার শিকারে পরিণত হবেন, এটা কাম্য নয়। তাই ইসলামী সংগঠনের প্রতিটি কর্মীকে ইহতিসাবের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইহতিসাবের কল্যাণকারিতা থেকে ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করতে হবে এবং সত্যকে অকাতরে মেনে নেয়ার মনোবৃত্তি রাখতে হবে।

ইহতিসাবের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে যেই ব্যক্তি সচেতন সেই ব্যক্তিই ইহতিসাবকে খোশ আমদেদ জানাতে পারে। এমন ব্যক্তির কাছ থেকে ইহতিসাবের যে জবাব আসবে তা সংগঠনের সুস্থতা অক্ষুণ্ন রাখবে এবং সংগঠনের কর্মীগণ আয়নার ভূমিকা পালন করার হিম্মত রাখতে পারবে।

কর্মী পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিচালককে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। প্রধানতঃ তাকে নিম্নে বর্ণিত কাজগুলো করতে হয় ঃ

(১) আদর্শের আলোকে মন মানসিকতা গঠন

স্রষ্টা, বিশ্বজাহান, পৃথিবীতে মানুষের কর্তব্য, অপরাপর মানুষের সাথে তার সম্পর্ক এবং জীবনের পরিণতি সম্পর্কে ইসলাম যেই দৃষ্টিকোণ পেশ করে তা কর্মীর চিন্তাধারায় সঠিকভাবে রোপণ করতে হবে। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা, দারসুল কুরআন, দারসুল হাদীস, পাঠ চক্র, ইসলামী বই পুস্তক পড়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবন বিধান সম্পর্কে কর্মীকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে।

(২) ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান

ইসলামী আন্দোলনের একটি নিজস্ব মিজাজ, কর্মসূচী, কর্মনীতি ও কর্ম পদ্ধতি আছে। এর ক্রমবিকাশের একটা নিজস্ব ধারা আছে। তেমনিভাবে ইসলামী সংগঠনও অনেকগুলো অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী সংগঠনের এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কর্মীকে অবশ্যই উত্তমভাবে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে।

(৩) ইসলামের বুনিয়াদী নির্দেশগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

ফারয, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুআক্কাদা সমূহের অনুশীলন, হালাল জীবিকা উপার্জন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে হারাম বর্জন করার এক দুরন্ত মানসিকতা কর্মীর মাঝে সৃষ্টি করতে হবে। এগুলোর গুরুত্ব বুঝাবার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো লংঘনের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কেও কর্মীকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে। তদুপরি অনৈসলামী পরিবেশের প্রভাব উপেক্ষা করে ইসলামের

অনুশাসনগুলো অনুসরণ করার জন্য যেই প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন তা জাগ্রত করে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।

(৪) মর্ম উপলব্ধি করে নিয়মিত আল কুরআন ও আল হাদীস অধ্যয়নে উদ্বুদ্ধকরণ

আল কুরআন ও আল হাদীস মহা জ্ঞান ভাণ্ডার। আল কুরআনের সর্বত্র আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পরিচয়, তাঁর মহাজ্ঞান ও তাঁর মহাশক্তির বর্ণনা পরিবেশিত হয়েছে। যতোই পড়া যায় ততোই এগুলোর উপলব্ধি মনের গভীরে শিকড় গাড়তে থাকে। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মহাশক্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে তার মাঝে এমন নির্ভীকতা সৃষ্টি হয় যার তুলনা আর কোথাও মিলে না। তদুপরি যেই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদেরকে উত্থিত করা হয়েছে তার মূলনীতিগুলো আল কুরআনেই রয়েছে। আল কুরআন পড়েই আমাদেরকে সেগুলো জানতে হবে। আর সেগুলোর প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করার জন্য প্রয়োজন ব্যাপকভাবে আল হাদীস অধ্যয়ন।

আল কুরআনকে তার ভাষাতেই মানুষের সামনে পেশ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মাতৃভাষায় তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী আল কুরআন পড়েই যাতে তার অর্থ বুঝতে পারে এতটুকু ভাষাজ্ঞান লাভ করার জন্য চেষ্টিত হতে হবে। নিরক্ষর কর্মীদের জন্য একথা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু শিক্ষিত যেই কোন কর্মী এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া দরকার। পরিচালক এই ব্যাপারে কর্মীকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করবেন।

(৫) জামায়াতের সাথে ছালাত আদায় করতে উদ্বুদ্ধকরণ

জামায়াতের সাথে ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদা। একাকী ছালাত আদায়কারীর চেয়ে জামায়াতে ছালাত আদায়কারীর মর্যাদা ২৭গুণ বেশি। সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ্‌র নিকট মাথা নত করাতে একটা আনন্দও আছে। প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেবার এবং তাদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের চমৎকার সুযোগও মিলে মাসজিদে জামায়াতে শরীক হয়ে ছালাত আদায়ের

মাধ্যমে। তদুপরি সুশৃঙ্খল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার ক্ষেত্রে জামায়াতে ছালাত আদায় করা অতি উত্তম এক পন্থা। এতগুলো ফায়দা হাসিলের জন্য কর্মীকে উৎসাহিত করা খুবই জরুরী।

(৬) আত্ম-সমালোচনায় উদ্বুদ্ধকরণ

সাধারণভাবে মানুষের ভুল হয়। তদুপরি শাইতান তো মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য তার পেছনে লেগেই আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবীদেরকে শাইতান থেকে মাহফুয রেখেছেন। তাই তাঁরা ছিলেন নিষ্পাপ। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষের প্রতিদিন অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়ে যেতে পারে। পূর্ণভাবে সচেতন না থাকলেই ভুল-চুক হয়ে যায়।

সেই জন্য প্রত্যেক কর্মী দিনের সব কাজ কর্ম শেষ করার পর ঘুমিয়ে পড়ার আগে নিবিষ্ট মনে নিজের সারা দিনের কাজ কর্ম, কথাবার্তা ও আচরণ পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। পর্যালোচনায় যদি কোন ভুল ভ্রান্তির কথা মনে পড়ে তার জন্যে আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাইতে হবে এবং এই ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি ঘটতে না পারে তার জন্য দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এভাবে আত্ম-সমালোচনা করতে থাকলে একজন কর্মীর জীবন থেকে ধীরে ধীরে অনেক ভুল ভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে। জীবনকে সুন্দর করার এই উত্তম প্রক্রিয়ায় যাতে কর্মী অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তার উৎসাহ যোগাবেন পরিচালক।

(৭) দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধকরণ

"আদ্‌দাওয়াতু ইল্লাল্লাহ"–র গুরুত্ব সঠিকভাবে কর্মীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। এই কাজ বাদ দিয়ে অন্যান্য যাবতীয় নেককাজ করলেও নবীরই রিসালাতের দায়িত্ব পালন হয় না বলে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন।

আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফারয। আর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কাজই হচ্ছে দীনের দাওয়াত সঠিকভাবে মানুষের নিকট পেশ করা। দাওয়াতী কাজের গুরুত্ব এবং দাওয়াত প্রদানকারীর মর্যাদা সম্পর্কে কর্মীকে পূর্ণভাবে সচেতন করে তুলবেন পরিচালক।

(৮) দাওয়াতী কাজে সহযোগিতা দান

দাওয়াত প্রদানকারীর বেশ ভূষা, কথাবার্তা বলার ভঙ্গি, আচরণ, ভাষার মান, যুক্তি প্রদর্শন পদ্ধতি ইত্যাদি কেমন হবে সেই সম্পর্কে কর্মীকে প্রয়োজনীয় হিদায়াত দেয়া প্রয়োজন। কোন্ কোন্ সময় দাওয়াতী কাজের জন্য উপযুক্ত সেই সম্পর্কেও কর্মীকে ধারণা দেয়া প্রয়োজন। অনুপযুক্ত সময়ে কোন ব্যক্তির নিকটে গিয়ে তাকে বিরক্ত করে লাভবান হওয়া যাবে না।

আবার বছরের বিভিন্ন সময়ে কিছু মওসুমী ইসলামী তৎপরতা চলে। সেই সময় লোকেরা ইসলামের দিকে অনেকটা মনোযোগী হয়। সেই মওসুমে দাওয়াতী তৎপরতায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্য কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করা পরিচালকের কর্তব্য।

(৯) দাওয়াতী কাজের রিপোর্ট গ্রহণ

কর্মীর টার্গেটকৃত ব্যক্তিরা কারা তা পরিচালকের জানা থাকা দরকার। তাদের সাথে কতটুকু যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, কী বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে এবং কী কী বই তাদেরকে দেয়া হচ্ছে সেই সম্পর্কে পরিচালক অবহিত থাকলে পরিচালক কর্মীকে সঠিকভাবে পরামর্শ দিতে পারেন। দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে কর্মীকে যেসব জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোর জওয়াবও তাকে সরবরাহ করা দরকার। প্রশ্নের জওয়াব দিতে না পারলে কর্মী দাওয়াতী কাজের উদ্যম হারিয়ে ফেলে। এসব কারণে কর্মীকে দাওয়াতী কাজে উপরোল্লেখিত পন্থায় সহযোগিতা দান করবেন পরিচালক।

(১০) ইনফাক ফী সাবীল্লিাহ-র জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

আল্লাহর পথে অর্থদান যে পথের পাশে হাত পেতে বসে থাকা ভিক্ষুককে দু'এক টাকা দান করার ব্যাপার নয়, এই বিষয়ে কর্মীকে সচেতন করে তুলতে হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে হলে নানা খাতে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। ইবলীসী শক্তি যেই গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তার মুকাবিলা করতে হলে ইসলামী আন্দোলনের গতি তীব্রতর করতে হবে। গতির তীব্রতা বাড়ানোর জন্য অত্যাধুনিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার

প্রয়োজন। আর এসব উপায়-উপকরণ প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ। এই অর্থের চাহিদা কর্মীদেরকে পূরণ করতে হবে।

একজন কর্মী নিজে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দান না করে অন্যদেরকে বেশি বেশি দান করার কথা বলতে পারে না। সেটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। এদিকে কর্মীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। তদুপরি শুভাকাঙ্খীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শও পরিচালক কর্মীদেরকে দেবেন।

(১১) সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধকরণ

একজন জীবন্ত মানুষ হিসেবে কর্মীকে প্রতিদিন অনেক রকমের কাজের দিকে মনোযোগ দিতে হয়। হালাল জীবিকা উপার্জনের সংগ্রামে তাকে সময় দিতে হয়। পরিবারের বহুমুখী কাজ তার আঞ্জাম দিতে হয়। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আব্বা, আম্মা ও অন্যান্য আপনজনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তাকে ভূমিকা পালন করতে হয়। এসব কিছু সামলাবার সাথে সাথে তাকে তার সময়ের একটি বিরাট অংশ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত করতে হয়। জীবনে যাদের শৃঙ্খলা নেই এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার অভ্যাস নেই তারা ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে এবং জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই নানা সমস্যার জালে জড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিচালককে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে হবে।

(১২) সময়-সচেতনতা সৃষ্টি

মানুষের আয়ু বলতে বুঝায় একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত থেকে আর একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত নির্ধারিত সময়। এই সময় শেষ হয়ে গেলে বলে কয়ে দেন দরবার করে এই পৃথিবীর অঙ্গনে আরো কিছুদিন বেঁচে থাকার কোন সুযোগ নেই। সময় সীমিত, অথচ কাজ অনেক। সময়–সচেতন হলে অনেক কাজই আমরা সম্পন্ন করে ফেলতে পারি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কর্মময় করে তোলার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলেই এই সীমিত সময়ে অনেক কাজ করা যায়।

অলসতা ত্যাগ করে সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি প্রয়োজন। সময়ানুবর্তিতাই সময় বাঁচানোর একমাত্র উপায়। একটি কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন করলেই আরেকটি কাজ সঠিক সময়ে করার সুযোগ পাওয়া যায়। তা না হলে সব কাজই এলোমেলো হয়ে যায় এবং কতগুলো কাজে একেবারে হাতই দেয়া যায় না। তাই কর্মীর মাঝে সময়-সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পরিচালকের প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

(১৩) পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ

মনের পরিচ্ছন্নতা অর্জনের জন্য কর্মীর মন থেকে হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, সন্দেহপ্রবণতা, পরনিন্দা প্রবণতা, দোষ অন্বেষণ প্রবণতা, অপছন্দনীয় কিছু দেখলেই খুঁত খুঁত করার প্রবণতা, তিলকে তাল করার প্রবণতা এবং কোন কথা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট অথবা যথার্থ ফোরামে না বলে এখানে ওখানে বলে বেড়ানোর প্রবণতা মন থেকে উপড়ে ফেলতে হবে। কর্মীকে খেয়াল রাখতে হবে যে নবী-রাসূল ছাড়া কেউ ভুলের ঊর্ধ্ব নন। ভুল ভ্রান্তি মানুষের নিত্য সঙ্গী। তার আরো মনে রাখতে হবে যে অবচেতনভাবে সে নিজেও কোন না কোন ভুলচুক অবশ্যই করছে। কারো কোন ভুল ভ্রান্তি স্বাভাবিকভাবে চোখে পড়লে তা এখানে ওখানে চর্চা না করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়ে দিলেই ব্যক্তির প্রতি ইহসান করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তির অজ্ঞাতে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট তার ভুল-ভ্রান্তি চর্চা করা তার প্রতি বড়ো রকমের যুল্‌ম।

প্রকৃতপক্ষে মাছি যেমন ময়লার ওপর বসে ভন্‌ ভন্‌ করে মনের পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে, একজন অপরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী ব্যক্তিও অন্যের দোষ ত্রুটি চর্চা করে সেই রকম তৃপ্তি পায়।

কর্মীর মনের এই অপরিচ্ছন্নতা দূর করার জন্য আল কুরআন এবং আল হাদীসের শিক্ষার সাথে তাকে পরিচিত করে তোলা পরিচালকেরই দায়িত্ব।

(১৪) কাজের পরিকল্পনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দান

পরিকল্পনার লক্ষ্য, পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কে কর্মীকে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনার তাৎপর্য উপলব্ধি

করতে না পারলে গৃহীত পরিকল্পনার প্রতি কর্মীর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে না এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সঠিক ভূমিকাও সে পালন করতে পারে না। তাই কর্মীর নিকট পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হওয়া দরকার।

(১৫) সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ

সংগঠনের কাজের বিভিন্ন বিভাগ থাকে। কর্মীর নৈতিক, মানসিক এবং দৈহিক যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মবন্টন করতে হয়। কর্মবন্টন করে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হয়। সঠিকভাবে নিজের কর্তব্য চিহ্নিত করতে পারলে কর্মী সহজভাবে ও নিঃসংশয় হয়ে কাজ করতে পারে। যেই কর্মীর ওপর কোন বিভাগের কাজ অর্পণ করা হয় না সেক্ষেত্রে মূল কাজ অর্থাৎ দাওয়াতী কাজই যে তার কর্তব্য তাও তার নিকট সুস্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। তা না হলে ভুল ধারণাবশতঃ সে নিজেকে বেকার কর্মী ভাবতে পারে। কোন বিভাগের দায়িত্ব যাকে দেয়া হয় তাকে কিন্তু দাওয়াতী কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় না, বরং দাওয়াতী কাজের ওপরে অতিরিক্ত কাজ চাপানো হয়। পুরো বিষয়টি সকল কর্মীর নিকট পরিষ্কার করে তোলা পরিচালকেরই কাজ।

(১৬) দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

শুধু কর্মবন্টন করে দেয়াই যথেষ্ট নয়। কাজের গুরুত্বটাও কর্মীর নিকট বিশ্লেষণ করা দরকার। আর কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ওপর যে গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অনেকটুকু নির্ভরশীল এটা তাকে বুঝাতে হবে। তদুপরি বর্তমান পরিকল্পনার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই যে পরবর্তী পরিকল্পনার পটভূমি রচনা করবে এই সম্পর্কেও কর্মীকে সচেতন করে তুলতে হবে। আবার বর্তমান পরিকল্পনার অপূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নই যে পরবর্তী পরিকল্পনাকে এক ধাপ নীচে সীমাবদ্ধ করে দেবে সেই ধারণাও তার থাকতে হবে।

(১৭) কাজের তদারক করণ

নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মীর কাজের দেখাশুনা করা দরকার। কাজ সম্পাদনকালে কোন ভুলচুক হয়ে থাকলে তদারকের সময় তা ধরা পড়ে

এবং সেই মর্মে কর্মীকে পরামর্শ দেয়া সম্ভব হয়। এতে করে ভুলের মাত্রা বাড়তে পারে না। কাজের বরকতও বিনষ্ট হয় না। তদারকের এই দায়িত্ব পরিচালককেই পালন করতে হয়।

(১৮) কাজের রিপোর্ট গ্রহণ

কাজ নির্দিষ্ট মিয়াদের জন্যই করতে দেয়া হয়। মিয়াদ শেষ হয়ে গেলে কাজ সম্পাদনের রিপোর্ট আদায় করতে হয়। কোন কর্মীর ওপর কোন কাজ অর্পণ করে নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালক যদি কাজের রিপোর্ট আদায় না করেন তাহলে বুঝতে হবে যে পরিচালকের নিকটই সেই কাজ গুরুত্ব পায়নি। ছোট হোক বড় হোক প্রদত্ত সকল কাজের রিপোর্ট পরিচালক অবশ্যই আদায় করবেন।

(১৯) রিপোর্ট পর্যালোচনা

কাজের রিপোর্ট আদায় করে তা ফাইলবন্দি করে রাখাতে ফায়দা নেই। কাজের যেই টার্গেট ছিলো তার সাথে কৃত কাজ তুলনা করে দেখতে হবে। এই তুলনার পর যেই ফল দাঁড়ায় তা সকলকে অবহিত করতে হবে। এভাবেই কর্মীদেরকে কাজের কমতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা এবং আরো বেশি কাজ করার জন্য তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে।

(২০) সমাজ কর্মীরূপে ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধকরণ

রুগ্ন মানুষের সেবা, দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের আশু চিকিৎসার ব্যবস্থা, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নেয়া, মৃত ব্যক্তির জানাযা ও দাফন কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন, মাসজিদের তত্ত্বাবধান, রাস্তাঘাট মেরামত, পুল নির্মাণ, মক্তব ইত্যাদি পরিচালনায় অংশগ্রহণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় চিঠি প্রেরণ, অনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধের জন্য জনমত গঠন, ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা, বিধবা ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধান, বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা, উদ্যোগী ব্যক্তিদেরকে স্বাবলম্বনে সহযোগিতা দান প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে কর্মীকে সমাজকর্মীরূপে আত্মগঠনে উদ্বুদ্ধ করা পরিচালকের অন্যতম কর্তব্য।

(২১) ব্যাপক পরিচিতি অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ

কর্মীগণ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের নিকট পরিচিত হওয়া দরকার। কর্মীকে দেখেই আসলে লোকেরা আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে তাদের মতামত গড়ে তোলে। কর্মীর বৈশিষ্ট্য দেখেই তারা সংগঠনের বৈশিষ্ট্য বুঝতে চেষ্টা করে।

কর্মী অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি হলেও তার মাঝে যদি আদর্শের সঠিক প্রতিফলন ঘটে তাহলে তার ব্যক্তিত্ব অন্যদের ওপর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। ব্যক্তি চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সহজে মানুষ কোন সংগঠনে আসে না। তাই ব্যক্তি চরিত্রকেই মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। এই জন্য প্রয়োজন কর্মীর সব মহলে যাতায়াত এবং পরিচিতি অর্জন। এ সম্পর্কে পরিচালক কর্মীকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন।

(২২) কর্মীকে সুবক্তারূপে গড়ন

এমন হতে পারে যে, এলাকার অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত অথবা অল্প শিক্ষিত। সেই কারণে ইসলামী সাহিত্য পড়া অথবা পড়ে তার মর্ম উপলব্ধি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ তাদেরকে আদর্শিক জ্ঞান দিতেই হবে। বক্তৃতা ভাষণের মাধ্যমেই এই কাজ করতে হবে। তাই কর্মীকে সুবক্তা হতে হবে। আকর্ষণীয়ভাবে নিজের বক্তব্য লোকদের সামনে পেশ করার যোগ্যতা কর্মীর থাকা চাই। শ্রোতাদের সমঝশক্তির সাথে সংগতিশীল হতে হবে তার ভাষার মান।

একজন ইসলামী কর্মীর সুবক্তা হওয়ার মানে এই নয় যে তার বাচনভঙ্গি ভালো। বাচন ভঙ্গির গুরুত্ব অবশ্যি আছে। তবে তার বক্তৃতায় আল কুরআন ও আল হাদীসের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাণীও উদ্ধৃত হওয়ার দরকার। পরিচালককে মনে রাখতে হবে যে তিনি যত বেশি সংখ্যক সুবক্তা তৈরি করতে পারবেন তাঁর সংগঠনের কাজ ততো বেশি গণ মানুষের মধ্যে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

(২৩) স্ব-চালিত কর্মীরূপে আত্মগঠনে উদ্বুদ্ধকরণ

আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদর্শিত কর্মপন্থা এবং খিলাফাতের দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের সৃষ্টির কথা অবহিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তির পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে কারো কাছ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে নড়াচড়া করবে না। বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ নির্দেশ তো আসবেই। কিন্তু আল্লাহর দিকে লোকদের আহ্বান জানানোর কাজ তো আমরণ করে যাবার কাজ। ঈমান আনার সঙ্গে সঙ্গেই তো এই কাজের দায়িত্ব প্রত্যেকের কাঁধে এসে পড়ে। এর জন্য পরিচালকের নিকট থেকে নির্দেশ আসা বা না আসার প্রশ্নই অবান্তর। দাওয়াতী কাজ বা অন্য কোন অর্পিত কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য কর্মীর স্বতঃস্ফূর্ততা খুবই জরুরী। ঠেলে ঠেলে কাজ করানো খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

(২৪) নতুন কর্মী গঠনের জন্য কর্মীকে উদ্বুদ্ধকরণ

একজন কর্মীর তার সহকর্মী সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা দরকার। যাদের মধ্যে সে দাওয়াতী কাজ করছে, যারা অনুকূল সাড়া দিচ্ছে এবং আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছে তাদেরকে আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠনের চাহিদা মুতাবিক গড়ে তোলার দায়িত্ব তাকেই পালন করতে হবে। প্রত্যেক কর্মী নতুন কর্মী সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে থাকলেই কালক্রমে এলাকায় একটি বড়ো কর্মীবাহিনী গড়ে ওঠে এবং তাদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গণ-ভিত্তি রচিত হয়। নতুন কর্মী সৃষ্টি মানবদেহে নতুন রক্ত কণিকা সৃষ্টির মতোই গুরুত্বপূর্ণ। আন্দোলনের অগ্রগতি ও ধারাবাহিকতা নতুন কর্মী গঠনের ওপরই নির্ভরশীল।

(২৫) সংগঠনের বক্তব্য যথাশীঘ্র অবহিতকরণ

সংগঠনের অভ্যন্তরে, জাতীয় জীবনে বা আন্তর্জাতিক ময়দানে বড়ো রকমের কোন ঘটনা ঘটলেই কর্মীর মনে প্রশ্নের উদয় হয় এবং সেই সম্পর্কে সংগঠনের বিশ্লেষণ জানার জন্য সে উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এই সম্পর্কে যথাশীঘ্র বক্তব্য জানতে না পারলে সংগঠনের নেতৃত্ব সম্পর্কে কর্মীর মনে

যেই সুধারণা থাকে তা শিথিল হতে শুরু করে। সেই জন্য এই জাতীয় বিষয়ে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংগঠনের বক্তব্য জেনে নিয়ে তা কর্মীকে জানিয়ে দেয়া পরিচালকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(২৬) নিষ্ক্রিয় কর্মীর সাথে যথাশীঘ্র যোগাযোগ স্থাপন

কোন কারণে মনে খটকা সৃষ্টি হওয়া, কারো আচরণে রুষ্ট হওয়া, কোন প্রপাগাণ্ডায় প্রভাবিত হওয়া, পরিস্থিতির ভয়াবহতায় ভীত হওয়া, কোন অবাঞ্ছিত ঘটনায় ব্যথিত হওয়া, নিজের জীবনে কোন অপরাধ ঘটে যাওয়া, ব্যক্তিগত জীবনে কোন বড়ো রকমের সমস্যা সৃষ্টি হওয়া–এ ধরনের কোন কারণে একজন কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। পরিচালক কোন কর্মীর এমন অবস্থার কথা শুনলেই শিগগির তার সাথে দেখা করে আসল কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করবেন এবং এই অবস্থায় করণীয় বিষয়ে আল কুরআন এবং আল হাদীসের শিক্ষা সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল করে তুলবেন। বারবার সাহচর্য দান করে তাকে পূর্ব মানে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। সংগঠনের একজন কর্মী নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে সংগঠন নামক দেহের একটা অংশ অবশ হয়ে যাওয়া। অন্যদিকে ব্যক্তির জন্য এটা দুর্ভাগ্যজনক। এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে কর্মীকে উদ্ধার করার জন্য দরদ ভরা মন নিয়ে চেষ্টা চালাবেন পরিচালক।

(২৭) পরামর্শ শ্রবণ

ইউনিট ভিত্তিক কাজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরী হলে কর্মীদের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক কর্মীর মাথাতেই কিছু চিন্তা থাকে। সবগুলো চিন্তা বিনিময় করে সংগঠনের ঐতিহ্যের আলোকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করতে হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে কর্মীর কাছে পরামর্শ চাইলে সে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করে। এভাবে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে। আর সংগঠনের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারলে সংগঠনের সাথে তার মনস্তাত্বিক সম্পর্ক আরো গভীর হয়।

(২৮) অগ্রসর কর্মীকে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ দান

অগ্রসর কর্মীকে মিটিং পরিচালনা, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নথিপত্র সংরক্ষণ, হিসাব সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে। সম্ভব হলে তার পরিচালনাধীন নতুন কর্মী ইউনিট গঠনের উদ্যোগ নিতে হবে।

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের পরীক্ষা

ইসলামী সংগঠনে কেবল নিষ্ঠাবান নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরাই অবস্থান করুক, এটাই আল্লাহ চান। যারা নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকে কেন্দ্র করেই যাদের জীবনের সামগ্রিক তৎপরতা পরিচালিত, তারাই ইসলামী সংগঠনের পবিত্র অঙ্গনে বিচরণ করার উপযুক্ত ব্যক্তি। সমাজ অঙ্গনে ইসলাম বহির্ভূত ব্যক্তিদের প্রতিপত্তি ও ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেখে যাদের মন-মানসিকতা প্রভাবিত হয় না ইসলামী সংগঠনের পবিত্র অঙ্গন তাদেরই জন্য। ব্যাধিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি ইসলামী সংগঠনের চৌহদ্দীতে প্রবেশ করলেও ব্যাধি দূর না হলে কোন না কোন এক সময়ে তাকে সংগঠন চ্যুত হতেই হয়।

ইসলামী সংগঠনের হিফাযাতের জন্য তথা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রভাব থেকে একে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এমন এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করেছেন যার কার্যকারিতা অতুলনীয়। এই প্রক্রিয়াকে ইসলামী সংগঠনের রক্ষাকবচ বলা যায়।

ইসলামী সংগঠনে যারা এলো তাদের মধ্যে কে ভেজালযুক্ত আর কে ভেজালমুক্ত তা স্পষ্ট করে তোলার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই সংগঠনের চলার পথ সুগম রাখেননি। এই পথ অতি দুর্গম। এই পথে আছে অনেক চড়াই উৎরাই।

যারা ভেজালযুক্ত তারা দুর্গম পথের বাঁকে কাফিলা থেকে ছিটকে পড়ে। যারা ভেজালমুক্ত তারা পথের দুর্গমতা উপেক্ষা করে দৃঢ় পদে সামনে এগুতে থাকে।

ইসলামী সংগঠনের কর্মীদেরকে প্রতিকূলতার মধ্যে ফেলে দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় কেউ ফেল করে। কেউ আবার কৃতকার্য হয়ে উন্নত মানের মুমিনে পরিণত হয়।

আল্লাহর ওপর যারা পরিপূর্ণভাবে তাওয়াক্কুল করতে পারে না প্রতিকূল

পরিবেশে তারা বিহ্বল হয়ে পড়ে। এদের সংখ্যাধিক্যের চাপ থেকে আল্লাহ সংগঠনকে হিফাযাত করে থাকেন।

তদুপরি যেই ব্যক্তি জীবনভর আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্যই তার সময়, শারীরিক শক্তি, চৈন্তিক যোগ্যতা এবং ধন সম্পদ ব্যয় করে তাকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামাত–জান্নাত দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন। যাকে তিনি জান্নাত দেবেন সে যে সত্যিকারভাবেই তা পাবার উপযুক্ত তার প্রমাণ সে রেখে যাক, এটাই আল্লাহর অভিপ্রায়। পরীক্ষার অন্যতম কারণ এটাও।

কে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী আর কে সত্যবাদী নয়, কে জিহাদে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত আর কে প্রস্তুত নয় তা তো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা এমনিতেই জানেন। কোন ব্যক্তির মনের আসল অবস্থা জানার জন্য তাঁকে পরীক্ষার রিজাল্টের ওপর নির্ভর করতে হবে ব্যাপারটি মোটেই এমন নয়।

আসলে আশ্‌শাহাদাহ বা সাক্ষ্যদানের দায়িত্ব কে পালন করছে আর কে পালন করছে না তা দুনিয়াবাসীর নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাই আল্লাহর ইচ্ছা।

আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণকারী যেই কোন ব্যক্তির এটা অবশ্য কর্তব্য যে সে তার কথাবার্তা ও কাজকর্মের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেবে যে সে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছে এবং কারো আল্লাহর নাফরমানিমূলক নির্দেশ পালন ও শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব নয়।

যেই ব্যক্তি কেবল মৌখিক সাক্ষ্য দেয় অথচ তার অন্তরে খাঁটি ঈমান থাকে না তার জান্নাত পাওয়ার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তদুপরি মেকী ঈমান নিয়ে তার ইসলামী সংগঠনে অবস্থানও আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়।

ঝড় এলে যেভাবে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ে, চলার পথে সংকট বা বিপদ এসে পড়লে তারাও সেভাবে ঝরে পড়ে। ঝড় তুফানের ঝাপটা সহ্য করে যে পাতাগুলো টিকে থাকে সেগুলো জীবন্ত ও মজবুত। তেমনিভাবে বিপদ সংকটের ঝাপটা সহ্য করে যারা ইসলামী সংগঠনে টিকে থাকে তারা নিষ্ঠাবান মুমিন।

বিপদ-সংকট তাই ইসলামী সংগঠনকে দুর্বল করে না, বরং তার মান উন্নত করে। ইসলামী সংগঠনের মান সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই এই বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া প্রবর্তন করেছেন।

ইসলামী সংগঠনে বাইতুল মালের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে কর্মীদের ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর পথে অর্থদান। দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মুমিনগণ যেন তাদের ধন সম্পদ অকাতরে দান করে তার নির্দেশ রয়েছে আল কুরআনের বহু স্থানে। নিম্নে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

وَتُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ـ

"এবং তোমরা আল্লাহর পথে সংগ্রাম কর তোমাদের মাল ও জান দিয়ে।"

– আস্‌সাফ ঃ ২১

وَاَنْفِقُوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

"এবং তোমরা অর্থ দান কর আল্লাহর পথে।" – আল বাকারাহ ঃ ১৯৫

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ـ

"হে মুমিনগণ, তোমরা দান কর আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না।" – আল বাকারা ঃ ২৫৪

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ـ

"যারা সচ্ছল অবস্থায় ও অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, যারা ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে।" – আলে ইমরান ঃ ১৩৪

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ - اَلَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا - لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

"প্রকৃত মুমিন তারাই যাদের অন্তর আল্লাহর কথা উল্লেখ করলে কেঁপে ওঠে, আল্লাহর আয়াত যখন পড়া হয় তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, তারা তাদের রবের ওপর আস্থা ও নির্ভরতা রাখে, ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যেই ধন-সম্পদ দিয়েছি, তা থেকে দান করে। এরাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে উচ্চ মর্যাদা, অপরাধের ক্ষমা এবং উত্তম রিযক।" – আল আনফাল ঃ ২

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ -

"যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে, আল্লাহর পথে মাল ও জান উৎসর্গ করেছে এবং যারা হিজরাতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।" – আল আনফাল ঃ ৭২

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং তাদের মাল ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আল্লাহর নিকট তাদেরই বড়ো মর্যাদা। তারাই সফলকাম।" – আত্ তাওবাহ ঃ ২০

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"হালকা বা ভারী যাই হও না কেন বেরিয়ে পড় (অর্থাৎ যে অবস্থাতেই তোমরা থাক না কেন) আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর–যদি তোমরা জান।"

– আত্ তাওবাহ ঃ ৪১

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। – আত্ তাওবা ঃ ১১১

وَلاَ يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلاَ كَبِيْرَةً وَّلاَ يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا اِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

"তারা অল্প বা বেশি যা কিছু খরচ করুক না কেন কিংবা কোন উপত্যকা অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে রেকর্ড করা হয় যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন।"

– আত্ তাওবা ঃ ১২১

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ـ

"তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয় বস্তুগুলোকে আল্লাহর পথে ব্যয় করবে।"

– আলে ইমরান ঃ ৯২

আত্মগঠনের অনেকগুলো প্রক্রিয়া আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রক্রিয়ার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(১) আল্লাহর দিকে আহ্বান

মুমিন আল্লাহর পথের পথিক। এই পথের পরিচয় লাভ করার পর একজন মুমিন চুপ করে বসে থাকতে পারে না। বস্তুতঃ চুপ করে বসে থাকার অনুমতি আল্লাহ্ তাকে দেননি। তাকে পৌঁছতে হবে অন্যান্য মানুষের কাছে। তাদেরকে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে। দায়ী ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীরূপে মুমিন তার জীবনকে গড়ে তুলবে।

(২) একাগ্রতা সহকারে ছালাত আদায়

ছালাত বা নামায ইসলামী যিন্দিগীর একটি বুনিয়াদী বিষয়। দেহ ও মন নিয়ে সার্বভৌম সত্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপনের এ এক অপূর্ব মহড়া। মানুষের যেই শির অপর কোন শক্তির নিকট নত হতে রাজী নয় সেই উন্নত শির বিশ্ব জাহানের স্রষ্টার উদ্দেশ্যে অবনত করা সত্যি অনন্য।

একজন খাঁটি মুমিন নিতান্তই গতানুগতিকভাবে ছালাত আদায় করে না। বিশ্বলোকের স্রষ্টার সামনে যেভাবে দাঁড়ানো উচিত এবং তাঁর দৃষ্টিতে যেভাবে পূর্ণাঙ্গ ছালাত আদায় করা উচিত সে সেভাবেই তা পালন করে। এই ধরনের ছালাতের মাধ্যমেই আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ আশা করা যায়। প্রাণহীন মহড়ার কোন দাম আল্লাহর কাছে নেই। কাজেই একাগ্রচিত্তে ছালাত আদায়ের অভ্যাস প্রত্যেক মুমিনেরই সৃষ্টি করতে হবে।

(৩) আল কুরআন অধ্যয়ন

আল কুরআনে আল্লাহ্, বিশ্বজাহান, পৃথিবীর জীবনে মানুষের কর্তব্য, ব্যক্তি

ও সমষ্টির সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের মূলনীতি, মানব জীবনের পরিণতি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান পরিবেশিত হয়েছে। এগুলো পরিবেশিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত ও বিজ্ঞজনোচিতভাবে। আল কুরআনকে তাই পড়তে হবে। এর গভীরে প্রবেশ করে এর নির্যাস সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন গভীর মনোযোগ এবং গবেষকের মন নিয়ে অধ্যয়ন। কেবল এভাবেই একজন মুমিন আল্লাহর মহাজ্ঞান ও বিচক্ষণতা উপলব্ধি করতে পারে। আর এই উপলব্ধিই হয় তার জীবনধারার নিয়ামক।

(৪) আল হাদীস অধ্যয়ন

আল্লাহর সাথে নিবিড়তম সম্পর্ক ছিলো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের সর্বোচ্চ জ্ঞান হাসিল করেছিলেন তিনি। তাঁর হাতেই হয়েছে সেই জীবন বিধানের সার্থক রূপায়ণ। তাঁর অনুসৃত ও প্রবর্তিত পদ্ধতি ছিলো নির্ভুল। রাসূলের পদ্ধতি অনুসরণ করেই রাসূলের সত্যিকার অনুসারী হওয়া যায়। আর এই অনুসরণকে আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন। কাজেই আল হাদীস অধ্যয়ন ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মীর প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হতে হবে।

(৫) সহায়ক সাহিত্য অধ্যয়ন

ইসলামী জীবন বিধানকে সহজ সরলভাবে মানুষের কাছে তাদের নিজেদের ভাষায় পরিবেশনের জন্য যুগে যুগে সাধনা করেছেন অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি। তাঁরা সৃষ্টি করেছেন ইসলামী সাহিত্যের ভাণ্ডার। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এসব বইতে। এগুলো পাঠকদেরকে দায়িত্ব সচেতন করে তোলে এবং আল্লাহর নির্দেশ মতো জীবন গড়ে তোলার প্রেরণা দান করে। তাই ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীর এসব সাহিত্যও নিয়মিত পড়া দরকার।

(৬) রাত্রি জাগরণ

আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপনের একটি উত্তম উপায় রাত্রি জাগরণ।

মানুষ যখন গভীর রাতে নিদ্রা ও আরামে নিমগ্ন, সেই সময়টিতে আরাম বর্জন করে আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য যেই ব্যক্তি শয্যা ত্যাগ করে আল্লাহর ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তাকে ভালো না বেসে পারেন না। আল্লাহ তার প্রতি রাহমাত ও বারকাত বর্ষণের জন্য এগিয়ে আসেন। ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মী সুযোগ পেলেই রাতের শেষাংশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট হাত পাতার অভ্যাস সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(৭) আল্লাহর পথে অর্থ দান

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষকে সরাসরি সমান পরিমাণ সম্পদ দান করেন না। কারো কারো হাতে বেশি পরিমাণে সম্পদ জমা হয়। কারো কারো হাতে এত কম পরিমাণ সম্পদ থাকে যে তার দিয়ে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় না। এই দু'ধরনের লোকের মধ্যে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার দায়িত্ব সরকারের। ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে অচিরেই এই বৈষম্য দূর হয়। ধনবানদের কাছ থেকে সম্পদের একটি অংশ আদায় করে তা নির্ধনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। ব্যক্তিগতভাবেও একজন মুমিন দুঃস্থ ও নিঃস্ব মানুষের কল্যাণের জন্য সাহায্যের হাত বাড়াতে হবে, এটা আল্লাহর নির্দেশ। তদুপরি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যেই সংগ্রাম পরিচালিত হয়ে থাকে তার জন্য অর্থদান করার নির্দেশও রয়েছে প্রত্যেক মুমিনের প্রতি। ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী অকুণ্ঠভাবে এই নির্দেশ পালন করবেন।

(৮) সকল কাজে আল্লাহর স্মরণ

আল্লাহর স্মরণই মানুষকে পাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তাই প্রতি দিনের যাবতীয় কাজ-কর্ম সমাপনের সময়েও মুমিন যাতে আল্লাহকে স্মরণ রাখতে পারে তার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন কাজের আগে ও পরে পেশ করার জন্য দু'আ শিখিয়েছেন। নিদ্রার প্রাক্কালে, নিদ্রা থেকে জেগে, আযান শুনে, পায়খানায় যাতায়াতকালে, উযুকালে, মসজিদে প্রবেশ ও নির্গমন কালে, পানাহারের পূর্বে ও পরে, পোশাক পরাকালে, আয়নায় চেহারা দেখার সময়ে, কোন কাজের শুরুতে ও শেষে,

কোন স্থানে রওয়ানা হওয়া কালে, সওয়ারীতে আরোহণকালে, বিপদের সময়ে অর্থাৎ যাবতীয় কাজ সম্পাদনকালে পঠনীয় দু'আ রয়েছে। অর্থ বুঝে এবং অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এসব দু'আ পড়লে অন্তর আল্লাহ মুখী হয়। ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মী ধীরে ধীরে তার ব্যবহারিক জীবনে এসব দু'আর অনুশীলন করতে সচেষ্ট হবেন।

(৯) রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি দরূদ পড়া

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন বিশ্ব মানবতার প্রতি আল্লাহর রাহমাত স্বরূপ। তাঁর প্রতি দরূদ পড়ার তাকিদ করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, যেই ব্যক্তি তাঁর প্রতি একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য দশটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন। তাই আত্মিক সমৃদ্ধির জন্য ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীর উচিত প্রতিদিন রাসূলের উদ্দেশ্যে দরূদ পড়া।

(১০) আত্ম-সমালোচনা

এটা কাম্য যে একজন কর্মী দিনান্তে তার নিজের যাবতীয় কাজের হিসাব নিজেই নেবে। রাতের ছালাত আদায় করে কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে তার সারাদিনের কাজ মনে মনে পর্যালোচনা করা উচিত। সারাদিনে আল্লাহর পছন্দনীয় যেসব কাজ হয়েছে সেগুলো স্মরণ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আবার যে সমস্ত অবাঞ্ছিত কাজ হয়ে গেছে তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সেসব কাজের যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এভাবে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীকে প্রতিদিনই নিজের নৈতিক মান উন্নত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(১১) ছাওম পালন

রামাদান ছাওম বা রোযার মাস। আল্লাহর ইবাদাতের এ এক বিশেষ মওসুম। ছাওম পালন একজন মুমিনকে প্রবৃত্তি দমন করে আত্মিক শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ দান করে। ছাওম সাধনা মুমিনের দেহ ও মনের ওপর এক

গভীর প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। সেই কারণে ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীকে মাহে রামাদানকে আত্মগঠনের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের মাস হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তদুপরি অন্যান্য মাসগুলোতেও কিছু নাফল রোযা রাখার চেষ্টা করতে হবে।

(১২) মৌলিক মানবীয় গুণ অর্জন

পরিশ্রমপ্রিয়তা, কষ্টসহিষ্ণুতা, সংযম, বিপদে দৃঢ়তা, সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, সাহসিকতা, বিশ্লেষণ শক্তি, উদ্ভাবন শক্তি, তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা, সংগঠন গড়ে তোলার যোগ্যতা, সংগঠন পরিচালনার যোগ্যতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা, নম্র ব্যবহার, উত্তম লিখন ও ভাষণ প্রভৃতি মৌলিক মানবীয় গুণ। সচেতনভাবে প্রচেষ্টা চালালে এসব গুণের বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মীকে এসব গুণের অধিকারী হওয়ার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে এবং এগুলো অর্জনের জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাতও করতে হবে।

(১৩) পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী কাজ বর্জন

(ক) অশালীন ও অশোভন কথাবার্তা

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ تَرَكَهُ اَوْ دعهُ النَّاس اتِّقَاءَ فُحْشِه ـ

"আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার অশালীন ও অশোভন কথা থেকে বাঁচার জন্য লোক তাকে এড়িয়ে চলে।" – সহীহুল বুখারী

জিহ্‌বা সংযত করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ـ

“যেই ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাযাতের যামিন হবে আমি তার জান্নাতের যামিন হবো।” – সহীহুল বুখারী

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ ـ

“আর যেই ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।”

(খ) গীবাত

কারো পশ্চাতে তার দোষত্রুটি চর্চা করার নাম গীবাত। এটা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আল্লাহ বলেন,

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ـ

“তোমাদের কেউ যেন কারো গীবাত না করে।” – আল হুজুরাত ঃ ১২

গীবাত যে কতোবড়ো পাপ তা বুঝাতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ـ

“গীবাত যিনার চেয়েও জঘন্যতর।”

(গ) আন্দাজ-অনুমান

আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে কারো প্রতি খারাপ মনোভাব পোষণ করা গুনাহর কাজ। এই সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ ـ

“হে মুমিনগণ, তোমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আন্দাজ-অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কেননা, কোন কোন আন্দাজ-অনুমান গুনাহর কাজ।”

– আল হুজুরাত ঃ১২

(ঘ) হিংসা

হিংসা এক জঘন্য দোষ। বরং এটা এক রকমের মনস্তাত্ত্বিক রোগ। এই রোগ থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

اِيَّاكُمْ وَالْحسدُ فَاِنَّ الْحسد يَاْكُلُ الْحسنَاتِ كَما تَاْكُلُ النَّارُ الْحطَبَ ـ

"হিংসা থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই হিংসা নেক কাজগুলোকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে থাকে।" – সুনানু আবী দাউদ

(ঙ) রাগ

রাগ মানব চরিত্রের অতি বড়ো এক দোষ। রাগের বশবর্তী হয়ে দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার অঙ্গনে প্রতিনিয়ত অসংখ্য অঘটন ঘটিয়ে চলছে। এই রাগের কারণে পারিবারিক, দলীয় ও সামাজিক সুস্থতা বিঘ্নিত হয়। মুমিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা রাগ দমন করে। এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لَيْس الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَة انَّما الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يمْلكُ نَفْسهُ عِنْدَ الْغَضبِ ـ

"বলবান সে নয় যে কুস্তিতে অন্যকে পরাজিত করে বরং বলবান সে যে রাগের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণ করে।" – সহীহুল বুখারী

(চ) অহংকার

অহংকারী ব্যক্তি আত্মপূজারী হয়। সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অন্যদেরকে হেয় জ্ঞান করে। ফলে তার সঙ্গে অন্যদের সম্পর্কের ব্যবধান থাকে। অহংকারী ব্যক্তি অন্যদেরকে ডিকটেট করতে চায়। কিন্তু অন্য কারো কথা বা পরামর্শ সে কানে তুলতেই চায় না। অহংকারী ব্যক্তি সংগঠন ও সমাজ জীবনে ফিতনা-ফাসাদের জন্ম দিয়ে থাকে। আল্লাহ আল কুরআনে বলেছেন যে

তিনি অহংকারীকে ভালবাসেন না। এক হাদীসে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ -

"যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

এখানে বড়ো বড়ো কতগুলো দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। এই জাতীয় যাবতীয় দোষ বর্জন করে ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মী চারিত্রিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবেন।

কর্মী গঠন কষ্টসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়। ধৈর্যসহকারে চেষ্টা চালাতে থাকলে ইসলামের সঠিক রূপ উপলব্ধিকারী একজন ব্যক্তিকে কর্মীরূপে গড়ে তোলা যায়। এই ধরনের একজন ব্যক্তি কর্মী না হওয়ার পেছনে অবশ্যই কোন না কোন কারণ থাকবে। সেই জন্য আন্দোলনের একজন কর্মী কোন ব্যক্তিকে কর্মী বানাবার জন্য বিচক্ষণতা সহকারে অগ্রসর হবেন।

(১) সাহচর্য দান

যাকে কর্মী বানাবার জন্য সিলেক্ট করা হবে সে তো এই সমাজেরই মানুষ। সমাজের বহু নারী ও পুরুষের সাথে তার মেলামেশা। তাদের কথাবার্তা, ধ্যান-ধারণা ও আচরণ দ্বারা সে নিশ্চয়ই প্রভাবিত। ইসলামের পথের আহ্বান শুনেই সে এক লাফে চলে আসতে পারে না। সে একজন সামাজিক জীব। তার মন উন্মুক্ত করার জন্য, মনের ভার লাঘব করার জন্য এবং ভাব-বিনিময় করার জন্য ওই লোকগুলো তার প্রয়োজন। ওসব লোকের বেষ্টনী থেকে মুক্ত করতে হলে তাকে সাহচর্য দান করতে হবে। তার আপনজনে পরিণত হতে হবে। তার বন্ধু মহলের বিকল্প একটি মহল তাকে দিতে হবে। এ পর্যায়ে দু'ধরনের কাজ করতে হবে ঃ

(ক) অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন

কিছু বই পুস্তক পড়ে অথবা কিছুকাল যাবত যুক্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনা শুনে সে ইসলামের দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু আগেকার ধ্যান–ধারণাগুলো মাঝে মাঝে তাঁর মনোজগতে উদিত হচ্ছে। সেগুলোর চাকচিক্য মাঝে মাঝে তার মনে একটা দোলা দিয়ে যায়। কোন্ আদর্শটি শ্রেষ্ঠতম এটা সে এখানো ভালোভাবে বুঝে ওঠতে পারেনি। এই বিষয়ে তার মনে এখনো দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হয়নি। তদুপরি এই পথে চলতে গেলে সে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার

আশঙ্কা দেখছে। বেশ কিছুকাল ধরেই তার মনে এই দ্বন্দ্ব থাকা স্বাভাবিক। মনের এই অবস্থাটা সত্যিই নাজুক। এই সময়টি একজন মানুষের জীবনের অন্যতম জটিল সময়। এই সময় ইসলামী সংগঠনের কর্মী তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে আল ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাগুলি তার সামনে স্পষ্টতর করে তুলতে থাকবে। লাভ–ক্ষতির সঠিক তাৎপর্য তাকে বুঝাবে। দুনিয়ার লাভের চেয়ে আখিরাতের লাভ যে অনেক বেশি বড়ো ও মূল্যবান তা তাকে বুঝাতে হবে। আশা করা যায় এক পর্যায়ে এসে সেই ব্যক্তির অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর হবে। ইসলামের প্রতি তার মনে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি হবে।

(খ) মানসিক দৃঢ়তা অর্জনে সহযোগিতা দান

এবার সেই ব্যক্তি নিজেকে ইসলামের অনুসারী বলে পরিচয় দিতে শুরু করবে। কিন্তু এই সময় তাকে অনেক হোঁচট খেতে হবে। তার পরিবার-পরিজন এবং পূর্বতন বন্ধুমহল তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলবে। তাকে নিয়ে হাসি–তামাশা করবে। তার সমালোচনা করবে। ইসলামের পথে অগ্রসর না হবার জন্য তাকে চাপ দেবে। বিভিন্ন ব্যাপারে তার সাথে অসহযোগিতা করবে।

এই সময় তার পাশে থেকে মুমিনের চলার পথে স্বাভাবিকভাবে যেসব বাধা আসে সেগুলো সম্পর্কে তাকে ওয়াকিফহাল করে তুলতে হবে। এসব বাধার মুকাবিলা করার জন্য তাকে সাহস যোগাতে হবে। আম্বিয়ায়ে কিরাম, আসহাবে রাসূল এবং পরবর্তী যুগের ইসলামের মুজাহিদদের পরীক্ষার ঘটনাসমূহ তার সামনে তুলে ধরতে হবে এবং পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার লক্ষ্যে মনোবল অটুট রাখার জন্য তাকে উৎসাহ দিতে হবে।

(২) সাংগঠনিক পরিবেশে আনয়ন

এই ধরনের বাধার মুকাবিলা করে যে সামনে অগ্রসর হয় তার পিছুটান দেবার আশঙ্কা কম। এবার তাকে সাংগঠনিক পরিবেশের সাথে পরিচিত করে তুলতে হবে। তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাজির করতে হবে। সাংগঠনিক

পরিবেশের পবিত্রতা ও চমৎকারিত্ব দেখে সে প্রীত হবে এবং নিজকে আরো দৃঢ় করে নিতে পারবে।

(৩) ছোট খাট দায়িত্ব অর্পণ

সাংগঠনিক পরিবেশে নিয়মিত আসা-যাওয়ার ভেতরে তার আন্তরিকতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠবে। এবার তাকে ছোটখাট কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব দিতে হবে। নিশ্চয়ই সে এগুলো সম্পন্ন করতে থাকবে। এভাবে কাজের প্রতি তার মনে সৃষ্টি হবে অনুরাগ। আবার কাজের অভিজ্ঞতাও সে অর্জন করবে এভাবেই।

(৪) অর্থ দানে উদ্বুদ্ধকরণ

এবার তাকে আল্লাহর পথে অর্থ দানের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ইনফাক ফী সাবীল্লিাহর তাৎপর্য ও গুরুত্ব তাকে বুঝাতে হবে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এতোদূর অগ্রসর হবার পর সে নিশ্চয়ই অকাতরে অর্থ দান করবে সংগঠনের বাইতুলমালে।

(৫) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রদান

অগ্রসরমান ব্যক্তির জন্য চাই প্রশিক্ষণ। ইসলামের প্রত্যয়বাদ, ইসলামী জীবন বিধান এবং অন্যান্য মতবাদের তুলনামূলক জ্ঞান দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। এজন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে তাকে যোগদানের সুযোগ দিতে হবে।

(৬) আহ্বান জ্ঞাপনের দায়িত্ব অর্পণ

এই পর্যায়ে উপনীত হবার পর তাকে আহ্বান জ্ঞাপনের গুরুত্ব বুঝিয়ে এই কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আল্লাহর দিকে আহ্বান জ্ঞাপনের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাকে করতে হবে ওয়াকিফহাল।

(৭) কাজের রিপোর্ট গ্রহণ

সপ্তাহে একবার খবর নিতে হবে তার কাজের। জেনে নিতে হবে কারা তার

টার্গেট। কী ধরনের বই তাদেরকে দেয়া হচ্ছে এবং কী ধরনের আলাপ হচ্ছে তাদের সাথে। তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দিতে থাকতে হবে। যদি দেখা যায় এই ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে আহ্বান জ্ঞাপন এবং সংগঠনের অর্পিত বিভিন্ন কাজ সঠিকভাবে পালন করছে তাহলে সে ইসলামী সংগঠনের একজন কর্মী হলো।

কর্মী গঠনের কাজ যত ব্যাপক হবে, ইসলামী সমাজ গড়ার সময়ও ততই ত্বরান্বিত হবে। আর নতুন কর্মী গঠনের এই কঠিন দায়িত্ব পালন করতে হবে পুরোনো কর্মীদেরকেই।

ইসলামী সংগঠনে কর্মীর মানোন্নয়ন

ইসলামী সংগঠনের কর্মতৎপরতা বহুমুখী। এসব কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করে কর্মীগণ অব্যাহতভাবে জ্ঞানগত ও সাংগঠনিক প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে। স্বাভাবিক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ার বাইরেও কর্মীদের মানোন্নয়নের জন্য বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম অবলম্বন করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিম্নে অত্যন্ত ফলপ্রসূ কয়েকটি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করছি।

(১) সাপ্তাহিক সভা

কর্মীর মানোন্নয়নের জন্য নিয়মিত সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাপ্তাহিক সভায় নিয়মিত যোগদানের মাধ্যমে কর্মীদের মাঝে সময়ানুবর্তিতা এবং সাংগঠনিক আনুগত্যের অভ্যাস গড়ে ওঠে। তদুপরি সাপ্তাহিক সভার আলোচনা কর্মীদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক। সাপ্তাহিক সভার কার্যক্রম নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) পরিচালক কর্তৃক সভার উদ্বোধন

(খ) দারসুল কুরআন বা দারসুল হাদীস

(গ) কর্মীদের কাজের রিপোর্ট গ্রহণ

(ঘ) অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

(ঙ) পরবর্তী সভার কার্যসূচী প্রণয়ন

(চ) পরিচালকের বক্তব্য ও সভার সমাপ্তি ঘোষণা।

(২) সংক্ষিপ্ত শিক্ষা শিবির

জ্ঞানের ব্যাপকতা বৃদ্ধির জন্য বেশি সংখ্যক কর্মীকে নিয়ে বেশি সংখ্যক

সংক্ষিপ্ত শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠান অত্যন্ত জরুরী। সংক্ষিপ্ত শিক্ষা শিবিরের কার্যক্রম নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) উদ্বোধন

(খ) দারসুল কুরআন

(গ) এক বা একাধিক প্রধান বক্তৃতা

(ঘ) বক্তৃতা ভিত্তিক আলোচনা

(ঙ) পরিচালকের বক্তব্য ও সমাপ্তি ঘোষণা।

(৩) পাঠ চক্র

আদর্শিক জ্ঞান বৃদ্ধি, আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দান, সাংগঠনিক পারদর্শিতা সৃষ্টি, সমাজ-সচেতনতা সৃষ্টি এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্ম-কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দানের জন্য পাঠচক্র অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। সমমানের অনুর্ধ্ব দশজন কর্মীকে নিয়ে পাঠচক্র গঠিত হয়। শুরুতেই পাঠচক্রের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কোর্স তৈরি করে নিতে হয়। পাঠচক্রের কমপক্ষে দশটি সেসন বা অধিবেশন হওয়া দরকার। দু'অধিবেশনের মাঝে এক মাসের বেশি ব্যবধান হওয়া উচিত নয়। পাঠ-চক্রের অধিবেশনের কার্যক্রম নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) পরিচালক কর্তৃক অধিবেশনের উদ্বোধন

(খ) পাঠ চক্রের প্রত্যেক সদস্যের বক্তব্য পেশ

(গ) প্রশ্নোত্তর

(ঘ) পরিচালক কর্তৃক সকলের বক্তব্য পর্যালোচনা

(ঙ) আলোচ্য বিষয়ের উপর পরিচালকের সমাপনী বক্তব্য।

(৪) দীর্ঘ শিক্ষা শিবির

ইসলামী জীবনাদর্শ, ইসলাম বিরোধী মতবাদ, ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী সংগঠন, ইসলামী আন্দোলনের কর্মকৌশল, কর্মীদের কাঙ্খিত মান ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান ও স্পষ্টতর ধারণা দানের উদ্দেশ্যে বেশি সংখ্যক কর্মী

নিয়ে তিন, পাঁচ বা সাতদিনের দীর্ঘ শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠান খুবই প্রয়োজনীয়। এই ধরনের শিক্ষা শিবিরের কর্মসূচী নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) উদ্বোধন (প্রথম দিন)

(খ) দারসুল কুরআন

(গ) দারসুল হাদীস

(ঘ) দুই বা ততোধিক প্রধান বক্তৃতা

(ঙ) বক্তৃতা ভিত্তিক আলোচনা

(চ) শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা

(ছ) সাধারণ প্রশ্নোত্তর

(জ) হাতে কলমে শিক্ষা (সহীহ্ করে আল কুরআন অধ্যয়ন, হিসাব রক্ষণ, নথি-পত্র সংরক্ষণ ইত্যাদি)

(ঝ) সমাপ্তি ভাষণ (শেষ দিন)।

(৫) বক্তৃতা অনুশীলন চক্র

বক্তৃতা ভাষণের মাধ্যমেই অগণিত মানব গোষ্ঠীকে ইসলামী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগঠন বুঝাতে হবে। সংগঠন যেই হারে সুবক্তা তৈরি করে কাজের ময়দানে পেশ করতে পারবে কাজের ব্যাপ্তি সেই হারেই বাড়বে।

কর্মীদেরকে বক্তা বানানোর জন্য বক্তৃতা অনুশীলন চক্র একটি ফলপ্রসূ প্রক্রিয়া। কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে গঠিত হবে একটি বক্তৃতা অনুশীলন চক্র। এর পরিচালনায় থাকবেন একজন দক্ষ পরিচালক। চক্রের জন্য তিনি সময় সূচী নির্ধারণ করবেন। বক্তৃতা অনুশীলন কার্যক্রম নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

(ক) পরিচালক কর্তৃক উদ্বোধন

(খ) চক্রের অন্তর্ভুক্ত কর্মীদের বক্তৃতা

(গ) পরিচালক কর্তৃক বক্তার সম্বোধন পদ্ধতি, বক্তব্য বিষয়ে জ্ঞানের গভীরতা, শব্দ চয়নের মান, ভাষার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা, বোধগম্যভাবে বক্তব্য

উপস্থাপনে ব্যর্থতা-সফলতা, বক্তব্য উত্থাপনে ধীরতা-দ্রুততা, অঙ্গভঙ্গি এবং বক্তৃতার আঙ্গিক (প্রারম্ভ, মধ্যভাগ ও সমাপ্তি) ভালভাবে পর্যবেক্ষণ ও নোটকরণ।

(ঘ) পর্যবেক্ষণ ও নোটের ভিত্তিতে পরিচালক কর্তৃক বক্তৃতা পর্যালোচনা

(ঙ) সমাপ্তি ঘোষণা।

(৬) ব্যক্তিগত আলাপ, জিজ্ঞাসা এবং পরামর্শ দান

একজন কর্মীর মান মূল্যায়নের জন্য তার সাথে আলাপ খুবই জরুরী। আলাপকালে বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তার জ্ঞান, অনুশীলন এবং সাংগঠনিক মান সম্পর্কে সঠিক ধারণা নিয়ে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া দরকার। নিসন্দেহে ব্যক্তি গঠনে এটি একটি উত্তম প্রক্রিয়া।

একটি ইসলামী সংগঠনের সূচনা করা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু একে সঠিক মিজাজে পরিচালনা করা এবং এর সংহতি সংরক্ষণ করা বড়োই কঠিন। কখনো কখনো দেখা যায় সংগঠনের সাথে জড়িত কিছু লোক ব্যতিক্রমধর্মী ভূমিকা পালন করছে।

প্রথমে এদেরকে সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের পরিবর্তে আংশিক আনুগত্য করতে দেখা যায়। কিছুকাল পর এরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। আরো কিছুকাল পর দেখা যায় এরা গীবাতের মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। তাদের এই ভূমিকা সংগঠনের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর।

যারা এই ধরনের ভূমিকা পালন করে তাদের মন-মানসিকতা বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করা সম্ভব। প্রধানতঃ নিম্নোক্ত কারণগুলো তাদের অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য দায়ী ঃ

(১) ইসলামী আন্দোলনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্টতা

ইসলামী আন্দোলনের একজন কর্মী কেবল আল্লাহর সন্তোষ অর্জনকেই তার জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বানিয়ে নেয়ার কথা। রিদওয়ানুল্লাহ বা আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে তার চিন্তাধারা ও কর্মপ্রবাহ। এই মৌল লক্ষ্য যদি ভালোভাবে মন-মগজে স্থান না পায় তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কোন লক্ষ্য অর্জিত না হতে দেখলে সে অস্থির হয়ে ওঠে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই। এই মানসিক অস্থিরতা থেকে জন্ম নেয় অসন্তোষ যা ক্রমশঃ তার চিন্তাধারা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করে।

(২) ইসলামী সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে অপূর্ণাঙ্গ ধারণা

ইসলামী সংগঠন আর অন্যান্য সংগঠনগুলোর মাঝে আকাশ-পাতালের পার্থক্য রয়েছে। ইসলামী সংগঠনের নিজস্ব কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর

নেতৃত্ব কাঠামো, নির্বাচন পদ্ধতি, আনুগত্য নীতি, পরামর্শ পদ্ধতি, ইহতিসাব পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে কর্মীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তা না হলে কর্মী সমাজ অঙ্গনে যেসব সংগঠন দেখে থাকে অথবা সে যেই সংগঠন থেকে এসেছে সেটির বৈশিষ্ট্যের আলোকে এই সংগঠনকেও বিচার করতে চাইবে। এতে করে যারা এই সংগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলো ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাদের চিন্তা আর এই কর্মীর চিন্তার মধ্যে বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়। চিন্তার এই দূরত্ব সংগঠনের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়।

(৩) ইসলামী আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সংশয়

ইসলামী আন্দোলনের একটি বিশেষ কর্মপদ্ধতি রয়েছে। জোর করে মানুষের ঘাড়ে সওয়ার হওয়া এই আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি নয়। এই আন্দোলন সমাজ পরিবর্তনের আগে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। আবার ব্যক্তির চিন্তাজগতে পরিবর্তন না এনে তার ব্যক্তিগত জীবনে কোন ফলপ্রসূ পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তাই ইসলামী আন্দোলনের মৌলিক কাজই হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারা থেকে জাহিলী ধ্যান ধারণাগুলোর মূলোৎপাটন করে সেখানে ইসলামী ধ্যান ধারণা রোপণ করা। ব্যক্তির চিন্তারক্ষেত্রে ইসলামী ধ্যান ধারণার চারা যতোই বড়ো হতে থাকে তার কর্মপ্রবাহেও পরিবর্তন সূচিত হয় আনুপাতিক হারে। এভাবে গড়ে ওঠা মানুষগুলোর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সমাজে ইসলামী জীবন বিধান প্রচলনের চাহিদা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ইসলামী আন্দোলনের গণভিত্তি রচিত হয়। তখন একটি প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করে ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করা যায়।

ইসলামী আন্দোলনের এই স্বাভাবিক কর্মপদ্ধতির সাথে ভালোভাবে পরিচিত না থাকলে একজন কর্মী ডানে বাঁয়ে কর্মরত বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তখন তার নিকট ইসলামী সংগঠনের অনুসৃত কর্মকৌশল অপ্রতুল মনে হয়। আন্দোলনের কর্মপদ্ধতির নির্ভুলতা সম্পর্কে তার মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় সংগঠনের অনুসৃত ধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানো তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৪) বিপদ মুসিবাত সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

ইসলামদ্রোহীদের ওপর বিপদ মুসিবাত আসে আযাবরূপে। আর মুমিনদের উপর তা আসে পরীক্ষারূপে।

চলার পথের বিভিন্ন মোড়ে ইসলামী সংগঠনকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় অনেকগুলো বিকল্প সামনে থাকে। যেই বিকল্পটি সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয় সেটিই হয় সংগঠনের সিদ্ধান্ত। সংগঠন জেনে বুঝে কোনদিন কোন কম উত্তম বিকল্পকে সিদ্ধান্তের ভিত্তি বানায় না। কিন্তু সব সময় সর্বোত্তম বিকল্প বেছে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকলেই সংগঠনের ওপর কোন বিপদ মুসিবাত আসবে না এমন ধারণা করা মস্ত বড়ো ভুল।

বিপদ মুসিবাত আল্লাহর সিদ্ধান্তক্রমে আসে। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যক্তি, দল বা জাতির ওপর বিপদ মুসিবাত আসতে পারে না। বিপদ মুসিবাত চাপাবার আগে তিনি সেই ব্যক্তি, দল বা জাতির সাথে পরামর্শ করে তা করেন না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি নিরঙ্কুশ স্বাধীন। তাঁর পক্ষ থেকে ইসলামী সংগঠনের ওপর যখন কোন বিপদ মুসিবাত আসে তাকে আযাব মনে না করে পরীক্ষা মনে করা প্রত্যেক কর্মীর কর্তব্য।

বিপদ মুসিবাত সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুপস্থিতি কর্মীকে বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত করে। চিন্তার বিভ্রান্তি কর্মীকে সংগঠনের স্রোতধারা থেকে ক্রমশঃ দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

(৫) অগ্রাধিকার নির্ধারণে অক্ষমতা

ইসলামী সংগঠন নানামুখী কাজ করে থাকে। আবার কর্মীদেরও এক একজনের এক এক ধরনের কাজের প্রতি বেশি আগ্রহ থাকে। কিন্তু যার যেই কাজের প্রতি বেশি ঝোঁক সে যদি মনে করে যে এই কাজটিকেই সংগঠন অগ্রাধিকার দেয়া উচিত তাহলে সমস্যার উদ্ভব না হয়ে পারে না। সাহিত্যামোদী কর্মী সাহিত্যচর্চাকে, শিল্পানুরাগী কর্মী শিল্প চর্চাকে, ক্রীড়ানুরাগী কর্মী ক্রীড়াকে, রাজনীতি প্রিয় কর্মী রাজনীতি চর্চাকে

অগ্রাধিকার দেবার চাপ দিতে থাকলে সংগঠন সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রের কাজের গুরুত্ব সংগঠনের সামনে তুলে ধরবে। এটা অন্যায় নয় বরং এটা হওয়াই উচিত। তবে সবকিছু বিচার বিশ্লেষণ করে সংগঠন যেই কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দেয় প্রত্যেক কর্মী সেগুলোকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। নিজস্ব পছন্দনীয় ক্ষেত্র সংগঠনের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিতে অগ্রাধিকার না পাওয়ায় খুঁতখুঁত করা ঠিক নয়। মনে এই ধরনের খুঁত খুঁতি থাকলে সামগ্রিক কাজের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়া সম্ভব হয় না।

(৬) মানসিক ভারসাম্যহীনতা

মানসিক ভারসাম্যহীনতা কর্মীকে সংগঠনের স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ভারসাম্যহীনতার অনেকগুলো লক্ষণ আছে। এখানে কয়েকটি প্রধান লক্ষণ উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) ত্বরা প্রবণতা

অতি শিগ্‌গির কাজের ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কর্মীর মনে দারুণ অস্থিরতা সৃষ্টি করে। যেই কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে ফল পাওয়ার জন্য কর্মী উদগ্রীব হয়ে উঠে।

(খ) অতি আশা

ভালভাবে পরিচিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে তার মনের কোঠায় নিজেই একটি ভাবমর্যাদা রচনা করে নেয়। মনে মনে সে তাদেরকে অতি মানবের স্থান দেয়। পরিচিত হবার পর সে দেখতে পায় তারা অতি মানবও নয়, অসাধারণ মানুষও নয়। তখন সে হতাশ হয়। কল্পিত মানুষটিকে পরিত্যাগ করে বাস্তব মানুষটিকে গ্রহণ করলে সমস্যা হয় না। সমস্যা সৃষ্টি হয় তখন যখন বাস্তব মানুষটিকে পরিত্যাগ করে কল্পিত মানুষটিকে গ্রহণ করা হয়।

(গ) চরমপন্থার প্রতি ঝোঁক

চরম মনোভাবাপন্ন কর্মী কোন সহকর্মীর সামান্য ভুল-ভ্রান্তিকেও বরদাশত

করতে প্রস্তুত নয়। যেই কোন ভুল-ভ্রান্তির সে কঠোর প্রতিবিধানের পক্ষপাতী। তদুপরি বিরোধীদের মুকাবিলায় হিকমাতপূর্ণ কোন কর্মপদ্ধতি তার ভালো লাগে না। গরম ও চরম ধরনের কোন কিছু না হলে তার পছন্দই হয় না।

(ঘ) অহংকার

অহংকারী ব্যক্তি আত্মপূজারী হয়ে থাকে। সে অন্যদেরকে হেয় জ্ঞান করে। নিজের চিন্তাশক্তি ও যোগ্যতা নিয়ে তার বড়ো গর্ব। অন্যদের সাথে খাপ খাওয়ানো তার প্রায়ই হয়ে ওঠে না।

(ঙ) অভিমান

কিছু সংখ্যক কর্মী আছে যারা সামান্যতেই অভিমান করে বসে। সহকর্মী বা নেতার উক্তি বা ব্যবহারে তারা অভিমান করে কাজ কর্ম ছেড়ে দেয়।

এই হচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীনতার কিছু লক্ষণ। মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি সামষ্টিক কর্মকাণ্ডে ডিফেকটিভ কল-কব্জার ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রধানতঃ এই ছয়টি কারণে সংগঠনের সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়। সংহতি বিনাশনে এগুলো রোগ জীবানুর মতো কাজ করে। এসব জীবানু যাতে সংগঠন দেহে প্রবেশ করতে না পারে অথবা প্রবেশ করলেও গোড়াতেই যাতে চিকিৎসা করা যায় সেই দিকে সংগঠন পরিচালকদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন।

মুখোশ-পরা দুশমনদের ভূমিকা

ইসলামী আন্দোলন যখন শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং যখন বাইরে থেকে আক্রমণ চালিয়ে তাকে স্তব্ধ করা যায় না, তখন ইসলামের দুশমনরা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। ভেতর থেকে আন্দোলনকে আঘাত হানার জন্য তাদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলামী সংগঠনে ঢুকে পড়ে এবং ক্ষতিকর তৎপরতা চালাবার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

এই ক্ষতিকর তৎপরতার প্রধান ধরন হচ্ছে ইসলামী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চরিত্রহনন। ইসলামী সংগঠনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রতি কর্মীগণ গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করে থাকে। এই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণেই ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য হয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অখণ্ড। আনুগত্য সাংগঠনিক শৃঙ্খলার প্রধান উপকরণ। তাই ইসলামী সংগঠনের সংহতি বিনাশ করতে হলে এই স্বতঃস্ফূর্ত ও অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে আঘাত হানতে হয়।

এই আঘাত হানার জন্য প্রয়োজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কর্মীদের মনে সংশয় সৃষ্টি করা। এই সংশয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ছোট খাটো মানবীয় ত্রুটি বিচ্যুতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে কর্মীবাহিনীর মধ্যে প্রচার করা হয়। এতে সফলতা অর্জন করার সম্ভাবনা দেখা না দিলে কল্প কাহিনী রচনা ও রটনা করে নেতৃত্বের সততা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির অবিরাম প্রচেষ্টা চালানো হয়।

ইসলামী সংগঠনে অনুপ্রবেশ করে ঘাপটি মেরে বসে থেকে ইসলামের মুখোশপরা দুশমনরা এই কাজই করতে থাকে। খোদ আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিচালিত সংগঠন এই আঘাতের সম্মুখীন হয়েছে বারবার। দুশমনরা বুঝেছিলো আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের চরিত্রহনন করতে না পারলে এই আন্দোলন কিছুতেই বিনাশ করা যাবে না। তাই তারা রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওপরও নৈতিক আক্রমণ চালাতে কুণ্ঠিত হয়নি। এখানে দু'টি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম আক্রমণ এসেছিলো আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সঙ্গে যায়নাব বিন্‌তু জাহাশের (রা) বিয়েকে কেন্দ্র করে।

যায়নাব বিন্‌তু জাহাশ (রা) ছিলেন আল্লাহর রাসূলের ফুফাতো বোন। তাঁরই উদ্যোগে এই কুরাইশ যুবতীর বিয়ে হয় তাঁরই আযাদ করা ক্রীতদাস যায়িদ ইবনু হারিসার (রা) সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের বনিবনা হয়নি। দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। অবশেষে যায়িদ (রা) যায়নাবকে তালাক দেন। আল্লাহর নির্দেশে এই তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করেন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

মুনাফিকগণ এই বিবাহকে একটা ইস্যু বানালো। তারা এই কল্পকাহিনী রটনা করলো যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পালকপুত্র যায়িদের স্ত্রী যায়নাবকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, পুত্র তা জানতে পেরে তাকে তালাক দেন এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই তালাকপ্রাপ্তা নারীকে বিয়ে করে তাঁর মনের খাহেশ মিটিয়েছেন। এভাবে মিথ্যার এক পাহাড় সৃষ্টি করা হলো। এই কল্প-কাহিনী মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। বিভ্রান্তির ধুম্রজাল ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকলো।

দ্বিতীয় আক্রমণ এসেছে এক অভিযান শেষে আয়িশার (রা) পেছনে পড়ে যাওয়া এবং এক সাহাবীর সাথে মাদীনায় ফিরে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর এক রাতের শেষভাগে মাদীনার দিকে রওয়ানা হবার প্রস্তুতি চলছিলো। সেই সময়ে আয়িশা (রা) ঘুম থেকে জেগে ওঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য একটু দূরে যান। ফিরে আসার সময় খেয়াল হলো যে তাঁর গলার হার পড়ে গেছে। তিনি হার খুঁজতে লাগলেন। এই সময়ে কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেলো। লোকেরা টেরই পেলো না যে আয়িশা (রা) পেছনে রয়ে গেছেন। ফিরে এসে আয়িশা (রা) গায়ের চাদর দিয়ে সারা শরীর ঢেকে সেখানে শুয়ে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। অতঃপর "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! রাসূলুল্লাহর বেগম এখানে রয়ে গেছেন" কথাগুলো শুনে তিনি জেগে ওঠেন। তিনি তাড়াতাড়ি চাদর দিয়ে তাঁর চেহারা ঢেকে নেন।

আগন্তুক ছিলেন অন্যতম সাহাবী সাফওয়ান ইবনু মুয়াত্তাল আস্ সুলামী (রা)। পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে তিনি আয়িশাকে (রা) দেখেছিলেন। তিনি তাঁকে চিনতে সক্ষম হন।

সাফওয়ান (রা) নিভৃত স্থানে ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম থেকে জেগে ওঠে দেখেন কাফিলা চলে গেছে। তিনি উটে আরোহণ করে মাদীনার পথ ধরেন। একটু এগুতেই তিনি আয়িশাকে (রা) দেখতে পেয়ে এভাবে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সাফওয়ান (রা) তাঁর উট বসিয়ে দিলেন। আয়িশা (রা) উটের উপর ওঠে বসলেন। সাফওয়ান (রা) উটের লাগাম টেনে হাঁটতে লাগলেন।

পরবর্তী মানযিলে কাফিলা থেমেছে। অমনি আয়িশাকে (রা) নিয়ে সাফওয়ান (রা) সেখানে পৌঁছেন। তখন সকলে জানতে পেলো যে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন।

মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলো। সে চিল্লিয়ে বললো, "আল্লাহর কসম, মেয়ে লোকটি নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। দেখ, দেখ, তোমাদের নবীর স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে একরাত কাটিয়ে এখন তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।"

এই বানোয়াট কাহিনী প্রচারে লেগে গেলো মুনাফিক দল। সরলপ্রাণ মুমিনদের একটি অংশও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অস্থির হয়ে ওঠেন।

মাদীনায় ফেরার পর আয়িশা (রা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এতোই বিচলিত হন যে তিনি প্রিয়তমা পত্নীর প্রতিও মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। মুনাফিকদের মিথ্যা প্রচারাভিযান রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলেছিলো। তদুপরি এই প্রচারাভিযান মুসলিম মিল্লাতের সংহতির প্রতি মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী নাযিল করে এই ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ না করলে সেদিন মাদীনায় গড়ে ওঠা নতুন ইসলামী শক্তির কি দুর্দশা হতো তা কল্পনা করতেও গা শিউরে ওঠে।

মনে রাখা দরকার যে মুখোশ পরা দুশমন এই যুগের ইসলামী সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করার জন্য একই কায়দায় তৎপরতা চালাতে পারে। এই সম্পর্কে ইসলামী নেতৃত্ব এবং কর্মীবাহিনীকে সজাগ থাকতে হবে।

ইসলামী সংগঠন একটি স্বাভাবিক পথ ধরে ক্রমবিকশিত হয়। এই ক্রমবিকাশের জন্য যেমন প্রয়োজন কর্মীদের নিরলস ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, তেমনি প্রয়োজন সময়ের। কাঙ্ক্ষিত মানের কর্মীবাহিনী গঠন এবং কর্ম এলাকার জনগণের মনে ইসলামী জীবন-বিধান গ্রহণের মন মানসিকতা গঠনের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। তড়িঘড়ি করে মানযিলে মাকসুদে পৌঁছে যাওয়া ইসলামী সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন একটি উপমার মাধ্যমে ইসলামী সংগঠনের ক্রমবিকাশের চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ -

"এ এমন এক কৃষি যা অঙ্কুর বের করলো, অতঃপর শক্তি সঞ্চয় করলো, অতঃপর মোটা-তাজা হলো এবং অবশেষে নিজ কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে গেলো।" – আল ফাত্হ ঃ ২৯

এই আয়াতাংশ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক পরিচালিত সংগঠনের ক্রমবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভের কথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করছে। এতে ক্রমবিকাশের চারটি পর্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। যথা ঃ

১। অঙ্কুর বের করা।

২। শক্তি অর্জন করা।

৩। মোটা-তাজা হওয়া।

৪। কাণ্ডের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

'অঙ্কুর বের করা' অর্থ হচ্ছে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনাকরণ।

'শক্তি অর্জন করা' অর্থ হচ্ছে আহ্বানে সাড়া দানকারী ব্যক্তিদেরকে সংঘবদ্ধ ও সংশোধিত করে সাংগঠনিক শক্তি অর্জন।

'মোটা-তাজা হওয়া' অর্থ হচ্ছে কর্ম এলাকার সর্বত্র প্রভাব সৃষ্টি ও গণ মানুষের সমর্থন লাভ। আর গণ-মানুষের সমর্থন লাভেরই আরেক নাম গণ-ভিত্তি অর্জন।

'কাণ্ডের ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে যাওয়া' অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন।

– সমাপ্ত –